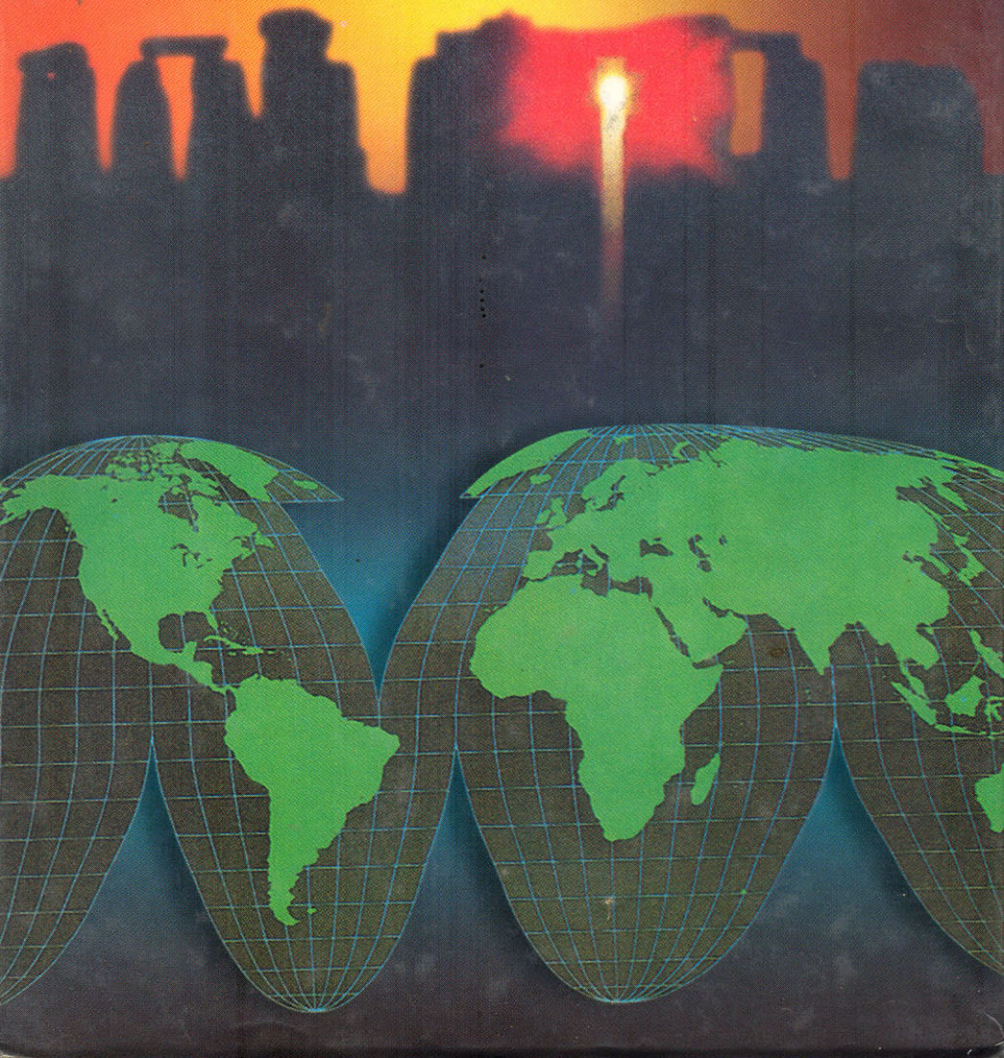
রাতভর সূর্য

মুহাম্মদ ইব্রাহীম



রাতভর সূর্য

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রে
আমার সহকর্মীদেরকে

ভূমিকা

বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যাবে না এমন কীই-বা আছে; সে প্রকৃতির মধ্যেই হোক, আর মানুষের কীর্তির মধ্যেই হোক? পারসিক কবির কথায় গাছের একটি পাতার মধ্যেই তো রয়েছে কত রহস্য! ভ্রমণকারীর সামনে পর্যটনমুখী যেসব দ্রষ্টব্য সাধারণত থাকে সেগুলোর নানা রূপ হতে পারে। ইতিহাসের রোমান্টিক কোন স্মৃতিচিহ্ন ভূগোলের কোন অদ্ভুত গড়ন, আদি-গুরুদের অথবা আধুনিক খ্যাতিমানদের চিত্র সমৃদ্ধ আর্ট গ্যালারি এমনি কত কিছুই তো হতে পারে। তার মধ্যেও এমন কিছু দ্রষ্টব্য থাকে যেগুলোকে বিজ্ঞানের বা প্রযুক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশেষভাবে দেখার অবকাশ আছে। এমনি কিছু আকর্ষণীয় জায়গায় ভ্রমণের কথা নিয়েই এই বই; বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটির কারণেই এরা বিজ্ঞান ভ্রমণ কাহিনী।

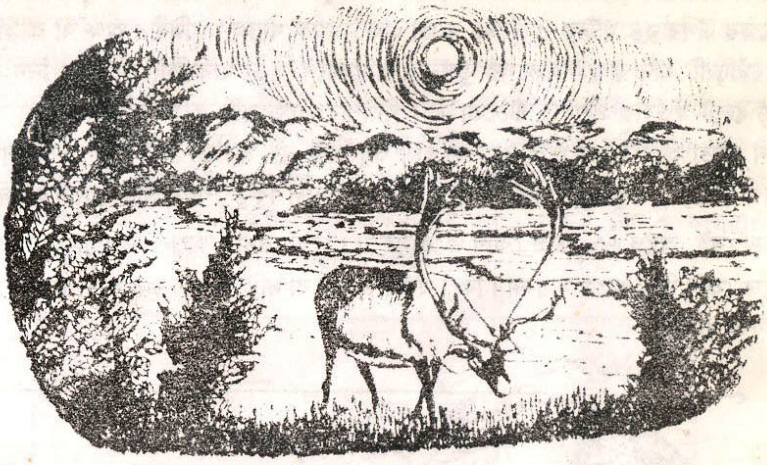
যেসব বিষয় নিয়ে এই বইয়ের নানা কাহিনী সেগুলোর প্রায় কোনটাই ওখানে যাওয়ার মূল কারণ ছিল না। কার্যোপলক্ষে নানা জায়গায় অবস্থানকালীন সময়ের এক এক ফাঁকে যা দেখার সুযোগ হয়েছে এ তারই গ্রন্থনা। ভ্রমণকারীর তাৎক্ষণিক অনুভূতিটুকুই এখানে মুখ্য। অবশ্য বেড়াবার অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমেও যে বিজ্ঞানকে খানিকটা উপস্থাপিত করা সম্ভব এমনি একটি বিশ্বাসও কাজ করেছে একে এভাবে লেখার পেছনে। শুধু নাম-প্রবন্ধ 'রাতভর সূর্য'-র বিষয়বস্তুটিই খানিকটা বিস্তৃতি আছে। উত্তর সুইডেনে মেরুবৃত্তের ভেতরকার কিছু ব্যতিক্রমী ভৌগোলিক দৃশ্য সম্বন্ধে এর কাহিনী। অন্যান্য লেখাগুলো এক রকম টুকরো ছবি, অল্প সময়ে দেখা বিষয়ের স্বল্পপরিসর বর্ণনা। আসলে 'টুকরো ছবি' এই নামে মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর একটি ফিচারে এদের অধিকাংশ আগে ছাপা হয়েছিল; এবার সেগুলো একত্রে গ্রথিত হলো।

২৫.৯.৮৬

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

রাতভর সূর্য ৯
উনিশ শ' বছর পর একদিন পম্পেইতে ২১
অস্ট্রেলিয়ার অভয়ারণ্য ২৯
হান্টসভিল আলাবামা ৩৫
তুতানখামেন ৩৮
পস্‌তয়নার গুহা ৪১
স্টোনহেন্‌জ ৪৪
আয়া সোফিয়া ৪৭
লাইডেন, পরম শূন্যের পথে ৫০
গ্যালিলিও স্মৃতি : ফ্লোরেন্স ৫৪
জয়পুর মানমন্দির ৫৭
আল্‌পসের শৃঙ্গ ইয়ুংফ্রাউ ৬০

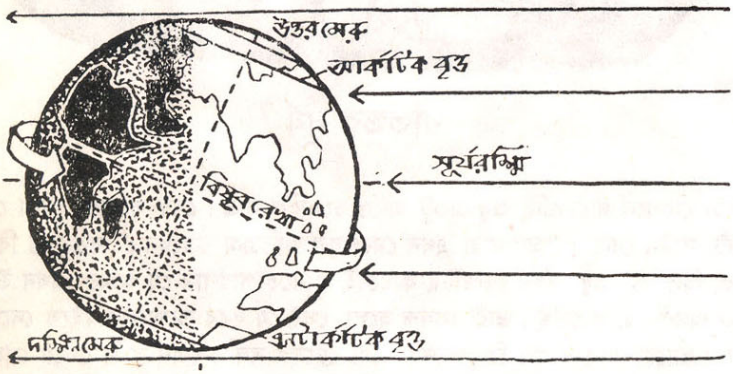


রাতভর সূর্য

ট্রেনটা সেখানে থামেওনি, শুধু একটু আস্তে চলেছিল মাত্র। সেই সুযোগে দেখা গেল একটা সাইন বোর্ড : "আপনারা এখন মেরু বৃত্ত অতিক্রম করছেন।" বৃত্ত-ফৃত্ত কিছুই আঁকা ছিল না—শুধু সাইন বোর্ডটির কারণেই জানতে পারলাম যে আমরা এখন উত্তর মেরু অঞ্চলে এসে গেছি। ভারী আনন্দ হলো, সেই যে কবে ভূগোলের বইয়ে দেখেছি এসব! আরো ভাল লাগল কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনের সব কয়জন যাত্রী পেয়ে গেলাম সুদৃশ্য একখানা করে সার্টিফিকেট। সুইডিশ কর্তৃপক্ষের দেয়া সার্টিফিকেটখানাতে যাত্রির নাম আর সেদিনের তারিখ দিয়ে লেখা আছে যে "উত্তর সুইডেনের নরবোটেন অঞ্চল দিয়ে আর্কটিক সার্কেল (মেরু বৃত্ত) অতিক্রম করার জন্য অভিনন্দন।" এখান থেকে অনেক দক্ষিণে সুইডেনের উপসালা শহরে আমার আপাত প্রবাস। উদ্দেশ্য পদার্থবিদ্যায় গবেষণা। উত্তরে মেরু অঞ্চলে এই শিক্ষা সফর তাতে কয়েকদিনের বৈচিত্র্য মাত্র।

আমরা আরো উত্তরের যাত্রী। যাত্রা শেষ হবে সুইডেনের একেবারে উত্তরে কিরুণাতে গিয়ে। কিন্তু এই ফাঁকে বুঝার চেষ্টা করি মেরু বৃত্তকে নিয়ে এত উচ্ছ্বাস কেন? মেরু থেকে কিছু দূরে ৬৬$\frac{১}{২}$ ডিগ্রি অক্ষ রেখায় কল্পনা করা হয়েছে এই বৃত্ত। ঠিক এখানে কেন? মজা হলো এই বৃত্তের ভেতরে যাকে মেরু অঞ্চল বলা হয়, সেখানকার প্রত্যেকটি জায়গায় বছরে অন্তত একটা দিন হলেও সূর্য ডোবে না—চব্বিশ ঘণ্টাই আকাশে সূর্য থাকে! বৃত্ত থেকে যতই উত্তরে যাওয়া যাবে ততধিক সংখ্যক দিন এরকম একটানা সূর্য থাকবে। আর ঠিক মেরু বিন্দুতে গিয়ে—ছয় মাসই দিন। একইভাবে অবশ্য বাকি ছয় মাস একটানা রাত। এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কারণটি কিন্তু সোজা।

সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে বছরে একবার করে ঘুরে আসার সাথে সাথে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টায় লাটিমের মতো একটা পাক খাচ্ছে। পৃথিবীর অক্ষ বা কাল্পনিক শিরদাঁড়াটি যদি কক্ষ-সমতলের তুলনায় সমকোণে খাড়া থাকতো, তা হলে দিন-রাত বড় ছোট হওয়ার প্রশ্নটাই উঠতো না। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গায় ঠিক বারো ঘণ্টা দিন হতো আর বারো ঘণ্টা রাত হতো। শুধু তাই নয় সব জায়গাই সূর্য থেকে সমান তাপ পেতো, ঋতুরও পরিবর্তন হতো না। আসলে কিন্তু শিরদাঁড়াটি এভাবে সোজা খাড়া নেই, আছে ৬৬½ডিগ্রি কোণ করে নুইয়ে। বিষুবরেখার কাছের জায়গাগুলোর জন্য এতে বেশি কিছু আসে যায় না। কিন্তু যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাব এর ফলে নানা ঘটনা ঘটতে থাকবে।

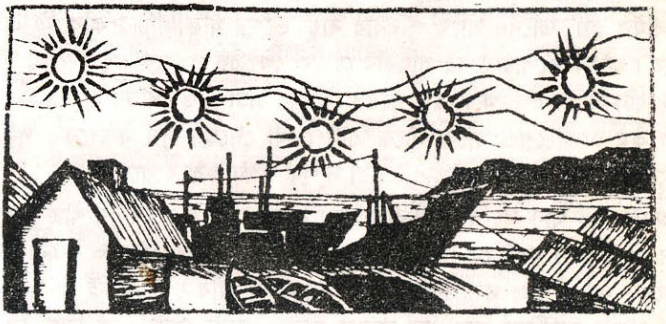


মেরুর কাছে এসে তো দেখা যায় বছরের এক সময় ওটা সূর্যের দিকে এমন মুখ করে আছে যে সারাক্ষণ তাতে আলো পড়ছে, রাত হচ্ছেই না। ঠিক সে সময় অন্য মেরু অঞ্চলটা সারাক্ষণ মুখ ঘুরিয়ে আছে সূর্যের দিক থেকে, সেখানে একটানা রাত। বছরের অন্য সময় অবশ্য পুরো ব্যাপারটা উল্টে যায়।

আমরা মেরু বৃত্ত অতিক্রম করেছিলাম জুনের ২১ তারিখে। রাতভর সূর্য দেখার জন্য সেটাই ভাল সময়—কারণ উত্তর মেরু সূর্যের দিকে হেলে থাকে সবচেয়ে বেশি। এর দুদিন পর ২৩শে জুন। আসলে সেই যেদিন মেরু অঞ্চলে ঢুকলাম তারপর সপ্তাহখানেক যতদিন ছিলাম আমাদের আকাশে সূর্য আর মোটেই অস্ত যায়নি! সারাক্ষণ আকাশেই ছিল।

উত্তরের ছোট্ট পাহাড়ী শহর কিরুনা। এই সময়টিতেই এখানে সূর্যালোক প্রায় একটানা, কাজের চাঞ্চল্য, লোকের আনাগোনা। শীতের সময় এখানকার কথা ভাবলে তো ভয় পেতে হয়—একটানা ভয়াবহ শীতের রাত। শ'খানেক বছর আগে এখানে পাওয়া গিয়েছিল পৃথিবীর বৃহত্তম লোহার সঞ্চয়। তাই তো শহর গড়ে উঠল এমন জায়গায়। লোহার কথা পরে লিখব, আপাতত সূর্যের কথায় থাকি। কিরুনার দু'পাশে দুটা পাহাড়—'লুইসাভারা' আর 'কিরুনাভারা'। ভাষাটা স্থানীয় অধিবাসী ল্যাপদের।

লুইসা মানে স্যামন মাছ, কিরুনা একটা পাখির নাম, ভারা মানে পাহাড়। যদিও নিত্য সূর্যালোকে বাস—তবুও ২৩শে জুন অর্থাৎ 'মিড সামার নাইটের' সূর্যটা আনুষ্ঠানিকভাবে সবাই দেখতে চায়। রাত এগারটা থেকে দলে দলে লোক রাস্তায় বের হয়ে বাইতে লাগলো লুইসা ভারা পাহাড়! স্থানীয় ছেলে বুড়ো আর পর্যটকদের সেই পর্বতারোহানে আমরাও যোগ দিলাম। কিসের রাত-দুপুর? বেলা চারটা বলেও মনে হচ্ছিল না। তবুও লুইসা-ভারার শীর্ষ থেকে দেখতে হবে মিড সামার নাইটের 'রাত-দুপুরে' সূর্যের কি অদ্ভুত আচরণ। ছবি তুলতে হবে, খানিকক্ষণ পর পর। সবাই তোলে আমরাও তুললাম। এক মুহূর্তের জন্যও সূর্যকে হারানো চলবে না।



রাত দুপুরের ঠিক আগে ও পরে পরপর নেয়া ছবিতে সূর্যের অবস্থান

রাত বারটার কাছাকাছি সূর্য একটু হেলে গিয়েছিল ঠিকই দিগন্তের দিকে। কিন্তু ডোবার ইচ্ছে থাকলেও যেন ডুবলো না। দিগন্তের খানিক উপর দিয়েই দ্রুত উত্তর আকাশ অতিক্রম করে আবার এটা উঠতে লাগলো উপরের দিকে—তারপর রীতিমতো রোজ রাত দু'টাতেই।

জুনের তেইশ তারিখ মিড সামার নাইট সুইডেনে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা একটা উৎসবের দিন। সেদিন (সে রাত?) লম্বা একটা গাছপাতার বংশ-দণ্ডের চারদিকে সবাই নাচে ঘন্টার পর ঘন্টা। পুষিয়ে নেয় দীর্ঘ শীতকাতর রাতের সমস্ত কষ্ট। সেদিন অত উত্তরে থাকার মতো সৌভাগ্য যাদের, তারা আনুষ্ঠানিকভাবে একবার দেখে নিশীথ সূর্যকে। অবশ্য সারাক্ষণ সূর্যের সাথে বাস এসময় তাদের। ঘড়ি ধরে কাজ করো, খাও-দাও, পর্দা টেনে রাত বানিয়ে তারপর ঘুমাও। প্রচণ্ড শীতটা তখন আর কষ্ট দিচ্ছে না, এটাই বড় কথা। সব সময় সূর্যের কথা মনে করে কে? সারাক্ষণ সাথে থাকলে কেউ কি কারো কথা মনে রাখে?

সুদিনে ওখানে গিয়েছি, তাই বলে দুর্দিনের কথাটি কি একবার ভাবতেও নেই? দিনের পর দিন, একটানা শীতের রাত সূর্যের মুখ দেখা নেই—কেমন লাগে! এ সম্বন্ধে আরো একটু ওয়াকেফহাল হওয়ার জন্য গিয়েছিলাম কিরুনার কাছে মেরু সম্পর্কীয় ঘটনাবলীর গবেষণা কেন্দ্রে। ওখানকার বিজ্ঞানীরা ছবি দেখিয়ে, রেখা-চিত্র দেখিয়ে, ফিল্ম দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এখানকার দীর্ঘ রাতের কাহিনী। রাত, কিন্তু একেবারে

নিকষ কালো রাত নয় মোটেই। প্রতিফলিত চাঁদের আলোকে প্রায়ই বাইরে বসে একটা বই পড়ার মতো আলো থাকে। আর আছে আরোরা বোরিয়ালিস—'উত্তরা আলো' বা 'মেরুজ্যোতি' (দক্ষিণ মেরুতে একে বলে আরোরা অস্ট্রালিস।) শীতে এসে দেখতে না পারাতে দুঃখ হলো। কারণ আরোরা নাকি প্রকৃতির সবচাইতে তাক লাগিয়ে দেয়া দৃশ্যসমূহের একটি—রীতিমত রাজকীয় আলোকছটা বলা যায়। আকাশজোড়া নানান রঙের আলোর খেলা— হঠাৎ ছটা দিয়ে যায়। কখনো রেখার আকারে, কখনো বেশ চওড়া ফিতার আকারে এঁকে-বেঁকে; যেন নানা রঙের নকশী কাঁথা রচনা করে।

আরোরার আলো নিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া যায়নি; গবেষণা চলছে। মনে করা হচ্ছে যে বাইরের মহাশূন্য থেকে বৈদ্যুতিক চার্জ সম্পন্ন যেসব অসংখ্য কণিকা নিত্য বর্ষিত হয়, তাদের সাথে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ধাক্কাধাক্কির কারণেই এই আলো সৃষ্টি হয়। কণিকাগুলোর উপর পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই চুম্বকের দুই মেরুর কাছেই এটা অধিক প্রত্যক্ষ। মেরু বৃত্তের ভেতরে এটা নিত্য ঘটনা হলেও—এর বাইরে অনেক কম অক্ষাংশেও মাঝে মাঝে এটা দেখা গেছে। সূর্য কলংকের পর্যায়ক্রমিক উথলানোর সাথেও আরোরা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা হয়েছে।

আলো যাই থাক বছরের অধিকাংশ সময়ে এই অঞ্চলে অবর্ণনীয় শীত। সূর্যের রশ্মি ওখানে গিয়ে পড়ে খুবই তেরছাভাবে, অনেকখানি বায়ুমণ্ডল তাকে অতিক্রম করে যেতে হয় পথে। ফলে তেজ তার কিছুই থাকে না। সূর্য আকাশে থাকেই বা কয়দিন? দীর্ঘ শীতে এখানে চারদিকে সব পুরু বরফে ঢাকা। ছোট ছোট বেশ কিছু হ্রদ রয়েছে। সেগুলোও জমে পাথর। তাপমাত্রা শূন্যের নিচে ৪০-৫০ সেন্টিগ্রেড তো নিত্য ঘটনা। ঘরের বাইরে যাওয়া, কাজ করা, তাদের ওসব গা সওয়া হয়ে গেছে। ওদের কথা পরে বলবো। ভাগ্যিস শীতের সময় যেতে হয়নি অত উত্তরে!

২

প্রকৃতির সবচেয়ে তাক লাগানো দৃশ্যগুলোর একটা দেখা হলো না কাছে গিয়েও। মেরু বৃত্তের ভেতরে গিয়েও আরোরা দেখা হলো না—একটানা সেই দিনের ভেতর। কিন্তু এখানে আর এটি দৃশ্য অপেক্ষা করছিল সেটিও ভোলার নয়। গ্লাশিয়ের বা হিমবাহ জিনিসটা যদিও এককালে হিম যুগে পৃথিবীর নানা জায়গায় দাবড়িয়ে বেড়িয়েছে এখন কিন্তু এদের দেখা মেলে শুধু সুদূর অগম্য সব জায়গায়। ঠাণ্ডা, বিশাল, জগদ্দল এই বরফ স্তূপগুলো দেখে অবাক হতে হয়। আরো অবাক হতে হয় এদের অতীত কীর্তিকলাপ দেখে। আসলে যেখানে গিয়েছি, মায় পুরো উত্তরাঞ্চলে এসব কীর্তিকলাপের এতচিহ্ন চারদিকে ছড়িয়ে আছে যে, হিমবাহ দেখুক আর না দেখুক তাকে স্মরণ করতেই হবে।

উপলক্ষটা ছিল শুধু হিমবাহ দেখা নয়, উত্তর সুইডেনের পার্বত্য অঞ্চলের ভেতরে টারফালায় হিমবাহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটিও দেখা। টারফালায় যাওয়া সহজ নয়। এর জন্য প্রথম যেতে হয় চারিদিকে উঁচু বরফ ঢাকা পর্বতের মাঝখানে একটি পর্বতারোহণ

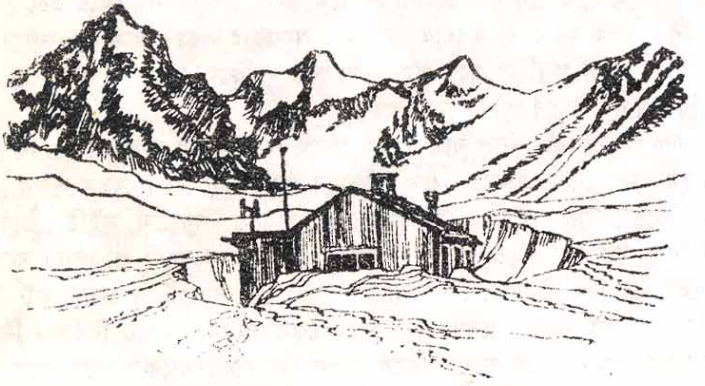
কেন্দ্র কেবনেকাইসেতে। কেবনেকাইসে আসলে সুইডেনের সর্বোচ্চ পর্বত। কেন্দ্রটিতে যেতে হলে হেলিকপ্টারই একমাত্র যোগাযোগ। অবশ্য শীতকালে চারদিকে বরফ যখন ঘন সমান হয়ে যায় তখন শ্লেজওয়ালা এক ধরনের গাড়ি চলে এর উপর। তখনই যোগাড় করে রাখা হয় কেন্দ্রের যাবতীয় রসদপাতি, খাবার-দাবার। এই জমিয়ে রাখা রসদ দিয়ে আতিথ্যের ত্রুটি হলো না সেখানে। কিন্তু দুরূহ কাজটা ছিল ওখান থেকে রওয়ানা হয়ে বরফ ঢাকা পার্বত্য পথে হেঁটে হিমবাহ স্টেশনে পৌঁছা। পাঁচ মাইলের মতো পথ, কিন্তু আমার মতো আনাড়ির পক্ষে সেটা অনন্ত পথ। মজার ব্যাপার হলো আমাদের দলের সাথে যিনি জুটে গেলেন তাঁর নাম হের ক্লাউজ—তিনি সুইডেনের একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটি অভিযাত্রী দলের সাথে এভারেস্ট আরোহণ করেছেন। পথে যেতে যেতে তিনি তালিম দিচ্ছিলেন কি করে পা দেয়ার আগে বরফের দৃঢ়তা পরীক্ষা করে নিতে হবে, জোরে পা ছুঁড়ে সিঁড়ির মতো করে বরফের ঢাল বেয়ে উঠতে হবে—ইত্যাদি। নিশ্চই খুব কৌতুক বোধ করছিলেন আমাদের অবস্থা দেখে। বরফগলা পানির খরস্রোতা ঝরণা পড়ছিল পথে পথে। লাফিয়ে লাফিয়ে সেগুলো পার হতে গিয়েও বিপত্তি কম নয়, কারণ পানির তোড় প্রচণ্ড।

এক পর্যায়ে এই অনন্ত যাত্রা শেষে চোখে পড়লো এক অপূর্ব দৃশ্য। বিশালকায় বরফের চাদর নেমে এসেছে—এক শক্তিমান পাষাণ হিসেবে। যেমন সুন্দর, তেমনি স্তম্ভিত করে দেবার মতো। এটিই এখানকার 'স্টোরা গ্ল্যাশিয়ারেন, সুইডিশ ভাষায় যার অর্থ 'বৃহৎ হিমবাহ'। এর পাশেই টারফালা হিমবাহ গবেষণা প্রতিষ্ঠন। কাছাকাছি রয়েছে আরো কিছু হিমবাহ, টারফালা হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠের সাড়ে তিন হাজার ফুট উপরে। গবেষণা কেন্দ্রই বটে। গবেষণার খাতিরে কেমনতরো জায়গায় নির্বাসন নিয়েছেন এখানকার কর্মীরা! এই যুগে লুকিয়ে যাওয়া হিমবাহগুলোকে বুঝতে হলে এছাড়া উপায়ও বা কি? সারা দুনিয়ার হিমবাহবিদগণ এখানে আসেন, কাজ করেন। কিছুদিন আগেই নাকি হয়ে গেছে এখানে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। জিজ্ঞেস করলাম 'কি করে এলেন সবাই?' উত্তর পেলাম : 'যেভাবে আপনারা আসলেন।'

হিমবাহ জিনিসটা জগদ্দল একটা ব্যাপার, এর চলন-চালানও তাই খুবই গদাইলস্করী। কিছু বুঝতে হলে বছরের পর বছর ধরে ধৈর্য সহকারে পরীক্ষা করে যেতে হয়। টারফালা কেন্দ্রের কর্মীরা হরদম একে মাপজোক করছেন, গভীর ছিদ্র করে খুঁড়ে দেখেন এবং ভেতরে, বিভিন্ন স্তরে বরফের ক্রিস্টালগুলো পরীক্ষা করছেন। যেসব গভীর ফাটল এতে রয়েছে তার মধ্যে নেমেও দেখছেন মাঝে মাঝে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে। অবশ্য এসব সম্ভব গরমের সময় একটানা দিন যখন রয়েছে। একটানা শীতের রাতে ওখানে থেকে বা কাজ করা প্রায় অসম্ভব। কেন্দ্র তখন পরিত্যক্ত হয়। হিমবাহবিদদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বোঝা গিয়েছে, অনেক কিছুই এখনো যায়নি।

হিমবাহ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরকে স্থান ও কালে অনেক বড় পটভূমির কথা মনে রাখতে হয়। মনে রাখতে হয় এখন তিনি যেই সীমিত বরফ স্তূপ নিয়ে কাজ করছেন তা বহু বহু যুগের তুষার সঞ্চয়ের ফলশ্রুতি; আর তার বিস্তৃতি একদিন ছিল

অনেকখানি জায়গা জুড়ে। পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসে কয়েকবার এসেছে 'হিমযুগ'। শেষ হিমযুগে নরওয়ে সুইডেনের সীমান্ত বারাবর পর্বত শ্রেণীতে বরফ জমেই এই অঞ্চলের হিমবাহের সূত্রপাত হয়েছিল যার অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা টারফালার এই হিমবাহ। এখান থেকে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়ে পর্বতের পশ্চিম ঢালে নেমে এটা আটলান্টিকে গিয়ে পড়েছিল। বরফময় সমুদ্রপার আর মস্ত মস্ত ভাসমান হিমশৈল ছিল এরই ফলশ্রুতি। আর পূর্বদিকে এরা এসে জমেছিল পর্বতের গায়ে। তারপর বিস্তৃত হয়েছে আজকের বাল্টিক সাগর তীর আর ফিনল্যান্ডে। হিমযুগে এই বিশাল হিমবাহ দক্ষিণে জার্মান সমভূমি পর্যন্ত নেমে এসেছিল—চলার পথে এই ভূখণ্ডে অসংখ্য পরিবর্তন ঘটিয়ে। টারফালার হিমবাহটি দেখে, তার সেই স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করতে হয় বৈকি!



টারফালার হিমবাহ গবেষণা কেন্দ্র

আজকের মস্কো, ওয়ার্সশ আর বার্লিন—এই তিনটি শহর যোগ করে যদি লাইন টানি—তবে সেটাই হবে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার থেকে নেমে আসা এই হিমবাহের অগ্রগতির শেষ সীমা। তারপর হিমযুগের সমাপ্তিতে এলো পিছু হটার পালা। তারপর থেকে ক্রমেই গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে এটা। আজ সুদূর উত্তর সুইডেনের পর্বতের গহীনে এসে তার ঠাঁই হয়েছে। খুব অল্প অল্প করে এখনো সে নিজকে গোটাচ্ছে। টারফালার বিজ্ঞানীরাও তাই বললেন—এসব মাপজোক রাখা তো তাঁদের কাজ। এটাকি তার স্থায়ী পশ্চাদপসরণ? বিশ্বাস নেই। কারণ অতীতে পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বহুবার এগিয়েছে আর বহুবার পিছিয়েছে। কে জানে হয়ত আবার কোনদিন এটা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নেমে আসার ফিকিরে আছে সামনের সমস্ত সাজানো জনপদকে তছনছ করে দিয়ে।

হিমবাহ 'প্রবাহিত' হবার কথা বলছি, সবকিছু গুঁড়িয়ে এগুনোর কথা বলছি, অথচ এ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করছি না সেটা কিভাবে সম্ভব। হিমবাহ জিনিসটাই বা কি? অগ্রসরমান বরফের স্তূপকেই হিমবাহ বলে। এ মুহূর্তে অগ্রসর না হলেও যা একদিন এগিয়েছিল বা আবার এগুতে পারে তাও হিমবাহ। এমনসব জায়গা যেখানে যত তুষারপাত হয় তা

সব গলতে না পেরে বরফ ক্রমাগত জমে উঁচু হয়েছে সেখানেই হিমবাহের উৎপত্তি। শেষ পর্যন্ত এত উঁচু স্তূপ হয় যে উপরের চাপে নিচের তুষার কঠিন বরফে পরিণত হয়।

কিন্তু এই কঠিন স্তূপ 'প্রবাহিত' হয় কেমন করে? যদিও এর পুরো ব্যাখ্যা এখনো আমাদের জানা নেই তবে এটা ঠিক যে হিমবাহ নদীর মতোই প্রবাহিত হয় সাগরের দিকে। তরল না হলেও এর একটা প্লাস্টিক বা নমনীয় গুণ রয়েছে। নদীর সাথে এর তফাত হলো এর প্রবাহের জন্য ঢাল বেয়ে নামার প্রয়োজন নেই। ঢাল না থাকলেও, এমন কি ঢাল বেয়ে উপরের দিকেও এটা উঠতে পারে। বরফের প্রচণ্ড চাপে এটা সম্ভব হয়। এই চাপের ফলেই এটা নিজেকে বাঁকিয়ে-ঝুঁকিয়ে, নিজের আকৃতি দরকার মতো বদলে নিয়ে সামনের দিকে এগুতে পারে। তবে খুবই ধীর এই প্রবাহ। অনেক সময় পুরো বছরে কয়েক ইঞ্চির বেশি এগোয়ই না! তবুও যুগ যুগ ধরে চললে এই প্রবাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন তা পরে ব্যাখ্যা করছি।

টারফালা হিমবাহ স্টেশনে বৃষ্টি নামলো বেশ ঝম ঝম করে। আগের রাতেও নাকি বৃষ্টি হয়েছে। আমাদের একজন প্রস্তাব দিল হোক বৃষ্টি, হিমবাহের উপর গিয়ে দেখতে হবে কেমন জিনিস এটা। কাছে ঘেঁষার পথটি সহজ ছিল না মোটেই। নিরাপদ দূরত্বে রইলাম। সাহসী যে কজন হিমবাহের উপর গিয়ে চড়লেন—দেখলেন কেলাসিত পিচ্ছিল বরফের কি বিপদ। এর মধ্যে বৃষ্টির ফলে নেমেছে অবিশ্বাস্য রকম পানির ঢল। এর উপরে ভাসমান বরফের খণ্ডগুলোতে একটার থেকে একটা লাফিয়ে চলতে হয়। স্টেশনের কর্মীরা আর যেতে দিলেন না।—ঝুঁকি খুব বেশি। এবার সেই দুর্গম পাঁচ মাইলি ফিরতি পথ। বৃষ্টির কারণে আরো দুরূহ। তবে বেলা ফুরোবার ভয় নেই, দিন যে অফুরন্ত। হিমবাহের কঠিন স্থবির রূপটির পরিচয় এখানে, কিন্তু তার কীর্তিকলাপের বিবরণ! এরপর সে কথাও বলতে হয়।

৩

স্কুলে আমরা ভূগোল পড়ি—কেমন করে ভূ-পৃষ্ঠে ভাঙা-গড়াগুলো ঘটলো। আজ পাহাড়, উপত্যকা, সমতল ভূমিগুলো থেকে এমনিতে বুঝার উপায় নেই এগুলো কি করে সৃষ্টি হয়েছে। কি করে বুঝব যে পুরো হিমালয় পর্বতটাই ধীরে ধীরে সমুদ্রের ভেতর থেকে জেগে উঠেছে! রাতভর সূর্যের যে দেশের কথা বলছিলাম, সেখানে কিন্তু এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। শুধু সেখানেই কেন পুরো সুইডেনেই আমার মনে হয়েছে ভূগোলের ঘটনাগুলো যেন এখানে একেবারেই মূর্তিমান হয়ে আছে। যেন ঘটনাগুলো সদ্য ঘটেছে—তার দাগ ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র। ভাবছিলাম ভূগোল স্যার এখানে বেড়াতে বেড়াতে যদি আমাদের ক্লাসগুলো নিতেন, তাহলে বোধ হয় অনেক কিছুই অনেক কম কষ্টে বুঝতে পারতাম!

সেখানে ঘটনার আসল নায়কটি কে? আর কে, সেই জগদ্দল শ্বেত দৈত্যের মতো ধীরে ধীরে এগুনো হিমবাহ। আজ তিনি বেকায়দায় পড়ে সুদূর উত্তরে পাহাড়ের ভিতর

মুখ লুকিয়েছেন বটে—কিন্তু একদিন সুইডেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দাবড়ে বেড়িয়েছেন সে চিহ্ন এখনো স্পষ্ট। বেশ শক্তিমান কেউ একজন যেন মাটিকে আচ্ছা করে আঁচড়িয়ে গেছে—তা বেশ বোঝা যায়। উপরে শুধু মিহি মাটি তারপর নিচের দিকে মোটা দানা—এমন মাটি এখানে বিরল। বরং বালি, কাদা, কাঁকর, বড় বড় গোলগাল পাথরের ঢেলা সবই একাকার হয়ে আছে যত্রতত্র। মনে হয় নানা জায়গা থেকে নানা জিনিস কুড়িয়ে এসে কেউ যেন এখানে ছড়িয়ে দিয়ে দেছে। বুলডোজারে ঠেলে আনা পাঁচমিশালী মাটি-পাথরের কথাই মনে পড়ে বেশি।

আর একটা জিনিস সাথে সাথে চোখে পড়ে—তা হলো দীর্ঘ ধনুকের মতো বাঁকানো পাথুরে টিলা। সাধারণভাবে সমতল জায়গার উপর দিয়ে অনুচ্চ এই টিলাকে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত হতে দেখা যায়। ভঙ্গিটা অনেকটা পাথর কুড়িয়ে একপাশে জমা করে করে যাওয়ার মতো। আর চোখে পড়ে বিরাট সব পাথর অপ্রাসঙ্গিকভাবে ইতস্তত ছড়ানো। মজার ব্যাপার হলো পাথরগুলো বিরাট হলেও বেশ গোলগাল, মসৃণ। প্রায় ক্ষেত্রেই স্থানীয় শিলার সাথে তার তেমন মিলও নেই। এসব দেখে বুঝা যায় এরা



দূর থেকে এসেছে, বেশ ঘষাঘষি খেয়ে। কে আনলো এদের এখানে? যেই আনুক সে নিশ্চয়ই যথেষ্ট শক্তিমান। প্রমাণস্বরূপ একটা ঘটনার কথা বলতে পারি। লেনিনগ্রাদ ওখান থেকে বেশি দূরে নয়। সেই লেনিনগ্রাদের নাম যখন সেন্টপিটার্সবার্গ তখনকার ঘটনা। রাশিয়ান জার পীটার দি গ্রেটের বিশাল মূর্তির বেদী হিসেবে ব্যবহারের জন্য এরকম একটা পাথর টেনে আনা হয়েছিল সেন্ট পীটার্সবার্গে। ৩৬ ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া পাথর। সবরকম যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মোট চার'শ লোক লেগেছিল একে নড়াতে। যেই দৈত্য এসব পাথর যত্রতত্র ছিটিয়ে দিয়ে গেল তার কথা একবার ভাবা যাক।

কে আনলো, কে আঁচড়ালো, কে কুড়ালো? হিমবাহের সাথে ভূগোলের মারফত পূর্ব পরিচয় আছে বলে এই সবের জন্য দায়ী এই অনুপস্থিত দৈত্যের কাজ জলবৎ স্পষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর জবাব প্রথম যাঁরা দেবার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের কাজটা

সহজ ছিল না। কুসংস্কারের যুগে লোকে নানা রকম অশরীরী শক্তির হাত এ সবের পেছনে চিন্তা করেছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা যাঁরা করেছেন তাঁদেরও কেউ ভেবেছেন মহা বন্যার ফলে এটা ঘটেছে, কেউ ভেবেছেন শুধু বন্যা নয় তাতে ভাসমান বরফের স্তূপগুলোও দায়ী। কঠিন বরফ নিজেই যে নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে সেটা বুঝতে মানুষের অনেকদিন লেগে গেছে।

এখন আমরা কল্পনা করতে পারি কেমন করে বরফে দৈত্যেরা পা পা এগিয়েছে। প্রচণ্ড চাপ নিয়ে এগুবার সময় এর তলার পাথর মাটির সাথে নিয়ে নিয়েছে। তলার স্তরে বরফ জমাট বেঁধে আটকে থেকেছে এসব জিনিস। ফল হয়েছে প্রকাণ্ড একটা শিরীষ কাগজের মতো ছোট পাথর-বালি-কুচি দিয়ে যার ভীষণ খসখসে তল। এই শিরীষ কাগজ আবার প্রচণ্ড চাপে ভূমির উপর ঘষে গেছে। ফলে বুঝতেই পারছি কিভাবে এটা ভূমিকে আঁচড়িয়েছে, ক্ষত-বিক্ষত করেছে। ক্ষতগুলো এমন বড় আকারের হতে পারে যে এর ফলে নানান জায়গায় ভূমির পানি চলাচলে বিপত্তি ঘটেছে। এভাবে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ছোট বড় হ্রদ, জলা। সারাটা সুইডেন এরকম হ্রদে ভর্তি। হাজার হাজার হ্রদ—কতগুলো নেহাৎ দিঘীর মতো আবার কতগুলো মাইলের পর মাইল বিস্তৃত।

হিমবাহ যেখানে এসে থেমেছে, যেখানে তার গলন ও পশ্চাদপসরণ শুরু হয়েছে সেখানেই সে বয়ে আনা অনেক মাটি-পাথর ফেলে দিয়েছে। কাজেই সেখানে তার গলনের লাইন বরাবর স্তূপাকারে এরা জমা হয়ে সেই পাথুরে টিলাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এদের দেখে হিমবাহের অতীত গতিবিধি এখন বেশ বোঝা যায়। পশ্চাদপসরণের সময় যেখানেই হিমবাহ কিছুদিন স্থির থেকেছে সেখানেই এই রকম টিলা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে আসার সময় হিমবাহের ঘষায় পাহাড় থেকে পাথরের বড় টুকরা খসে চলন্ত বরফের উপর পড়তে পারে। হিমবাহের পিঠে চড়ে এভাবে সব পাথরও বহুদূরে চলে যেতে পারে—যা আর কোনভাবে সম্ভব ছিল না।

টারফালায় গিয়ে যে সীমিত গোবেচারা হিমবাহের বন্দীদশা দেখলাম—এরাই যে অতীতের হিম যুগে কিভাবে পুরো দেশটার চেহারা দাঁড় করিয়েছে তা ভাবতে অবাক লাগে। অথচ সেসব কীর্তি অপকীর্তির সমস্ত চিহ্ন আজও সবার জন্য স্পষ্ট। এদের উৎসটা রাতভর সূর্যের দেশে হলেও এসব ঘটনা সেখানে সীমাবদ্ধ নয় মোটেই। সুইডেনের অনেক দক্ষিণে এসেও সে চিহ্ন স্পষ্ট। উত্তরে উৎসের কাছে হিমবাহ ক্ষয়ই করেছে বেশি, সঞ্চয় নয়। পাথর তুলে, মাটি উল্টে এখানে ভূমির বারোটা বাজিয়ে রেখেছে হিমবাহ। চাষবাসের প্রশ্ন তাই উঠে না। আর দীর্ঘ রাত, বরফে ঢাকা হুহু শীত এসব তো আছেই। অথচ এর মধ্যেই কিছু মানুষ যুগে যুগে বেঁচে এসেছে। আর বেঁচে এসেছে এখানকার সবচেয়ে প্রধান সবচেয়ে মূল্যবান পশুটি বল্গা হরিণ। অতীত কাহিনী ছেড়ে এবার বর্তমানের কথা বলতে হয়।

৪

সুমেরু বৃত্তের উত্তরে এখন আধুনিক কাজকর্ম চলছে কিছু কিছু। সে উপলক্ষে দক্ষিণের আধুনিক সভ্যতায় অভ্যস্ত লোকজন অল্প বিস্তর সেখানে বসতি করেছে, কাজ করছে। কিন্তু এই অঞ্চলের বরাবরের বাসিন্দা যারা, তারা যুগ যুগ ধরে এখানে বাস করছে এর বিশেষ পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়ে নিয়ে। গ্রীনল্যান্ডে, কানাডায় ওরা এস্কিমো। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ডের উত্তরে নিশীথ সূর্যের দেশে ওরা ল্যাপ। সুইডেনের যে অঞ্চলের কথা বলছি সেটা তাই ল্যাপল্যান্ড বলেই পরিচিত। এখনো ল্যাপরাই এখানকার সত্যিকার অর্থে বাসিন্দা—ওখানকার প্রকৃতির সাথে একাত্ম।

সুইডেন পৃথিবীর সব চাইতে উন্নত দেশগুলোর একটা। এই ল্যাপরা সুইডেনেরই বাসিন্দা। উন্নয়নের পরিবর্তন তাদের মধ্যে এসেছে বৈকি, কিন্তু তাদের জীবন পদ্ধতিকে একেবারে গ্রাস করতে পারেনি। কাজের অন্যান্য সুযোগ সত্ত্বেও এখনো অনেক ল্যাপের জীবন তার বল্গা হরিণের পালকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। বল্গা হরিণ আর ল্যাপদেরকে আলাদা করার উপায় নেই। সেই দুস্তর বরফের দেশ, দীর্ঘ শীতের রাতের দেশ সব রকম জন্তু-জানোয়ারের প্রতি সদয় নয় মোটেই। কিন্তু বল্গা হরিণটা ব্যতিক্রম।

শাখা-প্রশাখা সমেত একমাথা শিং নিয়ে এই হৃষ্টপুষ্ট প্রাণী এই অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে নিজেকে সুন্দর খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মেরুবৃত্তের ভেতরে কিছুটা অঞ্চল বনে ঢাকা—পাহাড়ের উপরে এবং এর ফাঁকে ফাঁকে। স্বল্পস্থায়ী গরমের সময় বল্গা হরিণগুলো বিরাট বিরাট ঝাঁকে পাহাড়ের উপর এসব গাছ-পালার মধ্যে চরে-বরে খায়। অল্প ক'দিনের সূর্যের ছোঁয়ায় এ সময় এখানে নানা রকম গুল্ম জন্মে যা বল্গা হরিণে খায়। শীতের আগে ওরা নেমে আসে নিচু জায়গাগুলোতে। শীত তাদের কাটে কি করে? শীতের মধ্যেও এখানকার শিলা পাথরের গায়ে একরকম শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের আস্তরণ পড়ে—যাদের 'লাইকেন' বলা হয়। এরা আলো বা উত্তাপের বড় একটা ধার না ধেরেই টিকে যেতে পারে। এই লাইকেনই বল্গা হরিণের শীতকালের খাদ্য—একে তাই 'বল্গা হরিণের শ্যাওলা'ও বলা হয়।

হেলিকপ্টারে করে পাহাড়ের উপর দিয়ে পার্বত্য স্টেশন কেবনেকাইসে'তে যাওয়ার সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়েছিল। নিচে পাহাড়ী উপত্যকা বরফে ঢাকা, হয়ত একটু একটু বরফ গলছিল। এর মধ্যে জড়াজড়ি করে আছে এক ঝাঁক বল্গা হরিণ। সাদা বরফের উপর অনেকগুলো কালো কালো দাগ মনে হচ্ছিল উপর থেকে আর সাথে তাদের ছোট ছোট বাচ্চারা। অবাক লাগে এই ধূ ধূ সাদা বরফে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এরা করছে কি? আসলে বরফের ফাঁকে ঐ লাইকেনই ওরা মজা করে খাচ্ছিল—এটা যে ওদের চারণভূমি!

এ অঞ্চলের বিশাল জায়গা জুড়ে হরিণগুলোর যাতায়াত। তাই ঘোরাফেরা করলে সবসময় ওদের দেখা মিলবেই। যেসব রাস্তা আছে সেখানে গাড়ির গতি কম রাখতে

হয়। হঠাৎ করে বল্গা হরিণ রাস্তা পার হবে প্রায়ই গাড়ি থামিয়ে তাদের পার হতে দিতে হয়।

অনেক ল্যাপ পরিবার এখনো বল্গা হরিণের উপর নির্ভরশীল। এক এক পরিবারের হয়তো রয়েছে চার'শ-ছয়'শ কি হাজার হরিণের পাল। খোলামেলা চরে বেড়ায় বটে—কিন্তু গায়ে মার্কা দেয়া আছে মালিকের। গরম পাহাড়ের উপর যতই চরুক, শীতের আগে আগে এরা ঠিক নিচে আসবে নির্দিষ্ট জায়গায়। এখানেই বসন্তে তারা বাচ্চা দেবে। মালিক পরিবারও বসত গড়ে এখানেই। যার হরিণের সাথে যেই বাচ্চা তার গায়েও লাগিয়ে দেয় মার্কা। এক সময় ল্যাপরা প্রায় সবকিছুর জন্যই বল্গা হরিণের উপর নির্ভর করতো। এর চামড়া দিয়ে ওরা তাঁবু তৈরি করতো, তৈরি করতো পোশাক আর যাবতীয় আসবাব। তাদের একমাত্র যানবাহন শ্লেজগুলো টানতো—সেও বল্গা হরিণরাই। ওরা খেতো বল্গা হরিণের দুধ আর মাংস। এখন অবশ্য ঐ মাংসটাই বল্গা হরিণ থেকে আসল আয়। শুধু ল্যাপরাই যে এটা পছন্দ করে তা নয়। সারা সুইডেনে ওটা খাওয়া হয়, সুইডেনে সবার পাতেই বল্গা হরিণের মাংস অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য বলে বিবেচিত।

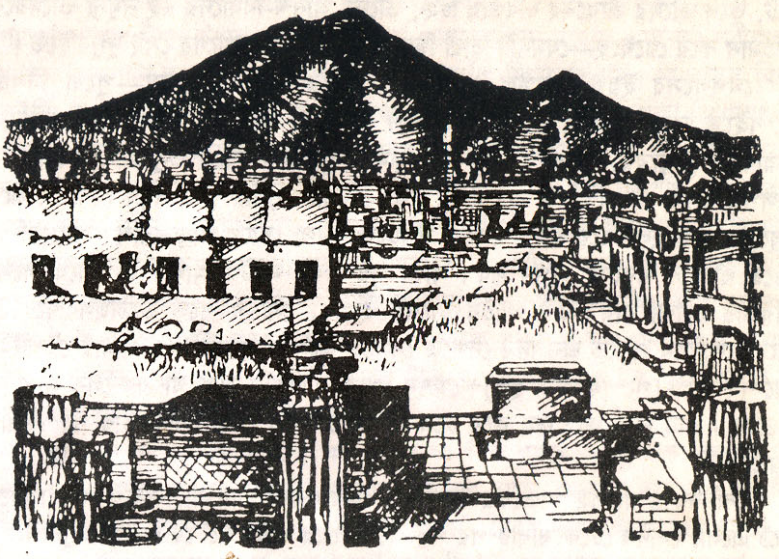


বল্গা হরিণ পালন এখন আর ল্যাপল্যান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি নেই। তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আজ এখানে রয়েছে। কিরুনার লোহার খনি বোধ হয় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ—বলতে গেলে এ শতাব্দীতে সুইডেনের অর্থনৈতিক চেহারা বদলে দিতে এর অবদান অনেক। সেই খনির মধ্যেও যাবার সৌভাগ্য হলো। একটা কোম্পানির অধীনে এই খনি যার নাম LKAB, সারা দুনিয়াতে মশহুর। আগে যে বলেছি দুই পাহাড় 'লুইসা ভারা' আর 'কিরুনা ভারা' তাদের নামেই নাম। আসলে কিরুনা ভারা পাহাড়টিরই অংশ লৌহ আকরিকের তৈরি। এর আহরণে খুব একটা ভূগর্ভে যেতে হয় না—পাহাড়ের ভেতরে সুড়ঙ্গ কেটে কিছু ঢোকা হয়েছে মাত্র। ওর মধ্যে ঢুকে দেখলাম চারদিকে ছড়ানো—ছোট-বড় অসংখ্য পাথরের ঢেলা—সবই লোহার আকরিক। লোহার পরিমাণ নাকি এতে খুবই বেশি। তাছাড়া এই আকরিক সাধারণত প্রাপ্ত লালচে

'হেমাটাইট' নয়—বরং কালো 'মেগনেটাইট'। মেগনেটাইটের সুবিধা হলো—এর চৌম্বক গুণের জন্য একে সহজেই অন্য সাধারণ শিলা থেকে আলাদা করা যায়।

এ শতাব্দীর শুরু থেকে কিরুনা খনি থেকে লোহা তোলা হচ্ছে—এখনো দেদার রয়ে গেছে। আসলে কিরুনা শহরটি গড়ে উঠেছে এই খনির জন্যই। দীর্ঘকাল পশ্চিম ইউরোপের ভারী শিল্পের জন্যই এই খনিই ছিল প্রধান অবলম্বন। এখান থেকে সামান্য উত্তরে উত্তর সাগর তীরে নরওয়ের বন্দর নার্ভিক। খনি থেকে সোজা ট্রেনে সেখানে যায় আকরিক। ওখান থেকে জাহাজে রটারডাম, তারপর রাইন নদীর বার্জ ধরে জার্মানির শিল্পাঞ্চলে অথবা সোজা উত্তর ইংল্যান্ডের বন্দরগুলোতে। এভাবেই চলেছে ইউরোপের ভারী শিল্প। আজ অবশ্য গুরুত্ব কমে গেছে—প্রতিযোগী এসেছে অনেক এই খনি থেকে—বিদঘুটে ময়লা জিনিস, কিন্তু কত গুরুত্বপূর্ণ এই স্মারক!

অভিজ্ঞতার কি অদ্ভুত সংমিশ্রণ। বরফে ঢাকা পাহাড়, দুর্গম জন-মানবহীন, হিমযুগের হিমবাহের বর্তমান আশ্রয়। ঘুরে বেড়াচ্ছে এই অদ্ভুত প্রকৃতির কোলে বল্গা হরিণগুলো আর তাদের মালিক ল্যাপরা। ওর মধ্যে দীর্ঘ রাতের পর সূর্য উঠলো তো আর ডোবার নাম নেই। আসছে দলে দলে পর্যটক—রাতদুপুরে সূর্য দেখবে এই বড় আশা। অথচ অঞ্চলের প্রধান কাজ যা তা হলো খনির কাজ। অনেক শ্রমিক ওতেই জীবিকা নির্বাহ করছে—অবদান রাখছে শিল্পায়নের সব চাইতে মৌলিক দিকটিতে। একটানা সূর্যালোকে পক্ষ-কালের এই অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার পর, বহুদিনের মরচে পড়া ভূগোল জ্ঞানকে ভাল করে নেড়েচেড়ে দিয়ে আবার সুমেরুর বৃত্ত অতিক্রম করতে হলো। এবার উল্টো দিকে—সেই পরিচিত জগতের দিকে যেখানে রোজ সূর্যকে বিদায় জানিয়ে ঘুমাতে যাওয়া যায়।



উনিশ শ' বছর পর একদিন পম্পেইতে

আমার ঘরে একটা ঘড়ি আছে, সেটা চলে না। কোন একদিন ঠিক দশটা পঁচিশ মিনিটে এর দম ফুরিয়ে গিয়েছিল, চিরতরে। ঘড়িটা আর চলেনি, কিন্তু দশটা পঁচিশ মিনিটের সেই মুহূর্তটাকে সে যেন স্তব্ধ, নিশ্চল করে ধরে রেখে দিয়েছে। ঘড়িতো সময় রাখার বহু জিনিসের মধ্যে একটি মাত্র। এই যে আমরা উঠছি, খাচ্ছি, ছুটছি দিনের আবর্তনের সাথে সাথে, সেও তো একটা ঘড়ির মতো, যদি কোনদিন সবাই মিলে তৈরি এই ব্যস্ততার ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তা চিরকালের জন্য ধরে রাখে আমার অচল ঘড়ির দশটা পঁচিশের মতো কোন একটি মুহূর্তকে? আর উনিশ শ' বছর পর আর একদিন আমি সেই অচল ব্যস্ততাকে আবার ঘুরে ফিরে নেড়েচেড়ে দেখি? কেমন লাগবে?

ইতালির পম্পেইতে ঠিক তাই হয়েছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিল ব্যস্তসমস্ত জলজ্যান্ত একটি শহর। কাছেই যে পাহাড়টার দৃশ্য নিত্য শহরবাসীদের মুগ্ধ করতো, যে পাহাড়ের ঢালের আঙ্গুর বাগান থেকে আসতো তাদের জন্য অদ্বিতীয় পানীয়, সেই ভিসুভিয়স হঠাৎ করলো অগ্নিবর্ষণ। উত্তপ্ত ছাই আর পাথর-নুড়িতে দ্রুত ঢাকা পড়ে গেল পুরো শহর। ৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট দুপুরের ঠিক পর। শহরবাসীরা কেউ খেতে বসেছে, কেউ-বা খেয়ে দিবানিদ্রার আয়োজন করছে। রাস্তাঘাটে ব্যস্ততা কিছু কম। ঠিক এমনি সময় ঘটলো এটা। যা কিছু চাঞ্চল্য, যা কিছু আর্তনাদ—তা কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। ছাই আর নুড়ির বিশ-বাইশ ফুট গভীর স্তরের তলায় চাপা পড়লো সব। আর চাপা পড়েই যেন জীবন্ত হয়ে রইলো সেই ক্ষণটি, সেই শহরটি এবং বলতে গেলে সেই শহরবাসী মানুষগুলো। ওরা ওখানে আর নেই

বটে, তবে তাদের জীবনের যাবতীয় চিহ্ন, তাদের আনন্দ-বিষাদের বহু নমুনা তাদেরকে মূর্তিমান করে রেখেছে—যেমনটি তারা ছিল উনিশ শ' বছর আগের সেই দুপুরটিতে।

নেপল্‌সের ইয়থ হোস্টেল থেকে খুব ভোরে রওয়ানা হলাম—পুরো দিনটা পম্পেইতে তার ৭৯ খ্রিস্টাব্দের পরিবেশে কাটাবো বলে। কোর্সো গ্যারিবাল্ডিতে পিয়াৎসার (চত্বরের) পাশেই স্টেশন। 'চিরকুম ভিসুভিয়ানা' নামে ভিসুভিয়সকে ঘিরে যে রেলপথ তারই স্টেশন। ঘণ্টা আধেকের পথ। চাষবাসে দুধার খুবই সমৃদ্ধ। বিশেষ করে সবুজের মধ্যে হলুদ হয়ে থাকা অসংখ্য টসটসে কমলা চোখে পড়ে বেশি। আগ্নেয়গিরি কাছে থাকাটা সবটাই বিপদ নয়। লাভা সৃষ্ট উর্বর মাটির আকর্ষণটা কাকে বলে, পরিষ্কার বোঝা যায়। এই মাটির টানেই হয়তো সেদিন গড়ে উঠেছিল পম্পেই, হারেকুলেনিয়ম প্রভৃতি জনপদ। দেখতে দেখতে এসে গেল আমাদের নামার স্টেশন—'পম্পেই স্কাভি (পম্পেই খনন স্থল)। স্টেশন থেকে দু'একটা রাস্তা যা একালের আধুনিক শহরের। এটা দ্রুত অতিক্রম করে চলে এলাম দেয়ালে ঘেরা সেদিনকার পম্পেইয়ের দুয়ারে।

সেদিনকার পম্পেই আজকের ইতালিতে কেমন করে তার প্রাচীন রূপ-লাবণ্য নিয়ে উঠে এলো? সেদিন ঢেকে যাবার পর পর পম্পেইয়ের ওপর ঘটেছে আরো অগ্ন্যুৎপাত। ওপর থেকে ক্রমে শহরটি হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন, চলে যায় বিস্মৃতির অন্তরালে। খ্যাতনামা রোমান পণ্ডিত প্লিনি এই দুর্ঘটনায় মৃতদের একজন। প্লিনির ভাইপো ছোট প্লিনি দুটি নাটকীয় চিঠি লিখেছিলেন পম্পেইয়ের দুর্দশার কথা জানিয়ে। এই চিঠি পম্পেই ঘটনার একটি প্রামাণ্য দলিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে কেউ ঠিক করে আর বলতে পারতো না কোথায় ছিল এই ঐতিহাসিক নগর। ১৯৪৮ সালে নেপল্‌সের রাজা চার্লস বুরব অঞ্চলটায় প্রথম খননের কাজ শুরু করান। অবশ্য তাঁর লক্ষ্য ছিল এখানে ওখানে দুএকটা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ভেতর থেকে কিছু মূর্তি বা প্রাচীন জিনিস হাতিয়ে নেয়া, এর বেশি কিছু নয়। নেপোলিয়নের সময় ভালভাবে কাজ শুরু হয়। সেই থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ধীরে ধীরে অতি যত্নে উদ্ধার করে তুলেছেন একটি পুরো শহরকে। আজও এই কাজ চলেছে।

আজ পম্পেই একটা পুরোদস্তুর নগরী—৭৯ সালের রোমান নগর জীবনের অনেক কিছুই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। রোমানদের অনেক কিছু কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু ভিসুভিয়সের ছাই আর পাথর তাদের এই নগরটিকে ষোলটা শতাব্দী ধরে সযত্নে ঢেকে রেখে দিয়েছে। তার রাস্তা, বাড়ি, প্রমোদক্ষেত্র, পৌরকেন্দ্র, গার্হস্থ্য জীবনের টুকিটাকি, আসবাব, সবকিছু জ্বলজ্যান্ত অক্ষত রয়ে গেছে। ঘরের দেয়ালে ছবিগুলোর রংটুকুও এখনো তার ঔজ্জ্বল্য হারায়নি। ঢেকে যাওয়ার ঘটনাটি খুব দ্রুত ঘটেছিল বলে কিছুই বদলাবার সময় পায়নি।

দেয়ালেঘেরা প্রাচীন পম্পেইয়ের যে দুয়ার দিয়ে ঢুকলাম সেটা হলো শহরের স্টেডিয়াম প্রান্ত, খেলাধুলার ব্যবস্থাগুলো ওদিকে উপবৃত্তকার এম্‌ফিথিয়েটারটি অর্থাৎ স্টেডিয়ামটি বারো হাজার লোকের বসার উপযুক্ত করে তৈরি। নগরে লোকই ছিল মোট বিশ হাজার—বুঝুন খেলাধুলায় কত আগ্রহ। এখানকার খেলাধুলাটা অবশ্য সময় সময়

হিংস্র প্রকৃতিরই হতো—প্রধানত গ্লাডিয়েটরদের মরণপণ মল্লযুদ্ধ। ধাপে ধাপে গ্যালারিগুলোর উপর চাঁদোয়া খাটাবার জন্য পাথরের থাম রয়েছে এখনো। শরীরচর্চার আসল জায়গাটা অবশ্য এর পাশেই পালেস্ট্রা অর্থাৎ জিমনেসিয়াম। মাঝখানে বিরাট সুইমিং পুল। তিনদিকে ঢাকা জায়গা যেখানে শরীরচর্চা শিক্ষা চলতো। খেলাধুলার এলাকা থেকে বের হয়েই দেখলাম শহরের বেকায়দা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা। দুপাশে ঘিঞ্জি দালান, শান বাঁধানো রাস্তা, সোজা চলে গেছে। সরু ফুটপাথ। সমান্তরালে আছে আরো রাস্তা, আড়াআড়িতে আরো। রাস্তার ক্রসিংগুলোতে আছে সুন্দর ফোয়ারা। আজ যারা রাস্তায় আসা-যাওয়া করছেন তারা সবাই পর্যটক, ম্যাপ ধরে খুঁজে নিচ্ছেন কোন বিশেষ দালান, কোন বিশেষ বাড়ি বা অন্য কিছু। কিন্তু সবকিছু এমন তরতাজা রয়েছে যে দিব্যি কল্পনা করা যায় রোমান পোশাকে পুরুষ ও মহিলারা হেঁটে চলেছে, অথবা চলেছে ঘোড়ার পিঠে, কি ঘোড়ায় টানা রথে। চলতে চলতে ভুলে যেতে হয় কখনকার কোন শহরের পথচারী আমি!

রাস্তার দুপাশের দালানগুলো কি? একটা আধুনিক শহরে যা যা থাকা দরকার তার প্রায় সবই এদের মধ্যে। কোনটা দোকান, কোনটা বাড়ি, কোনটা দফতর। আধুনিক শহরের মতোই ব্লকে ব্লকে বিভক্ত এই দালানগুলো। নেহাৎ দায়সারা কাজের দালান নয় এগুলো, রীতিমতো কারুকার্য করা থাম-খিলান নিয়ে। সে সময়কার রোমান স্থাপত্যের সুন্দর প্রতিফলন এদের অনেকগুলোতে। ডোরিক, আয়োনিক, করিনথিয়ান, তাসকান সে যুগের সব রকমের নমুনা রয়েছে এসব স্থাপত্যে। দালানগুলোর এটা ওটায় ঢুঁ দেয়া যায় অনায়াসে। পুরো রাস্তার ছবি তোলার জন্য তরতর করে উঠে গেলাম এদের একটার উপরের তলায়। এমন সুন্দর পরিপাটি বাড়িও রয়েছে যে ভুলে যেতে হয় এর যে মালিক সে বাস করতো আজ থেকে উনিশ শ' বছর আগে। নেহাৎ ছোটও নয় শহরটা। চারদিকের নগর দেয়ালটাই দু মাইলের মতো লম্বা। এ পর্যন্ত খুঁড়ে বের করা হয়েছে যেটুকু ঘন সংবদ্ধ নগর—তা ১৬১ একর জমির ওপর।

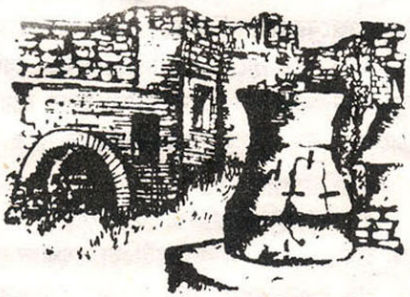
পম্পেইকে সবচেয়ে বেশি জীবন্ত মনে হয় এর রাস্তাঘাটে, বাড়িতে লেখাজোখাগুলো দেখলে। রোমান হরফে ল্যাটিন ভাষায় কোথাও দেয়ালের ওপর লেখাগুলো বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে লাল বা কালো কালিতে। আবার অন্যত্র চোখা কিছু দিয়ে আঁচড়ে লেখা হয়েছে দেয়ালে। আজকাল অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এদের স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে নষ্ট না হবার জন্য। কি নিয়ে এসব লেখা? একটা কর্মব্যস্ত নগরজীবন যেসব লেখা থাকার কথা। অনেকগুলোই বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ ধরনের। এম্‌ফিথিয়েটারে শিগগির কি প্রতিযোগিতা হতে যাচ্ছে, নতুন নাটকের মঞ্চস্থ হবার সংবাদ, অথবা আরো সাধারণ 'ভাড়াটে চাই' কি 'হারানো বিজ্ঞপ্তি'। দুর্ঘটনার কিছু আগেই বোধ হয় শহরের একটা পৌর নির্বাচন হতে যাচ্ছিল। কারণ বেশ কিছু ইশতেহার নির্বাচনী ক্যানভাস সংক্রান্ত 'অমুককে ভোট দিন,' 'তমুক ভাই জিন্দাবাদ' গোছের। ওয়ার্কশপ, কারখানা, পাঠশালার বিজ্ঞাপনও রয়েছে স্থান বিশেষে। বড় রাস্তার পাশে এমফিথিয়েটারে, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বাড়িতে এ জাতীয় বিজ্ঞপ্তিগুলো দেখা যায়—যেখানে নানারকম জনসমাগম হয়ে থাকে।

আরো কিছু লেখাজোখা আছে যেগুলো অতো সার্বজনীন প্রয়োজনে নয়—কিছুটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা সখে। দেখলাম এক ধনী মানুষের সুন্দর বাড়ির সামনে মোজাইক পদ্ধতিতে হিংস্র একটা চেইনে বাঁধা কুকুরের ছবি নিচে লেখা CAVE CANEM 'কুকুর থেকে সাবধান।' অন্যত্র কোথাও পুরানো কর্জের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, কোথাও এলোমেলো লেখা আছে ভালবাসা-বাসির কথা—এমনকি অশ্লীল কথা, রসিকতাও বাদ নেই। এসব দেখার পর কেউ কি বলতে পারে পম্পেই মৃত শহর, বিগত শহর। লেখার প্রতিটা আঁচড় এমন সাম্প্রতিক, এমন জীবন্ত, মনে হয় যাদের জীবনের কথা এরা, তারা এখনো এই শহরে রয়ে গেছে কোথাও। মৃত শহর না বলে পম্পেইকে বরং বলা উচিত প্রাচীন কালের একটা শহর যাকে আজকের আমাদের জন্য এদ্দিন ধরে জীবন্ত করে রাখা হয়েছে—উনিশ শ' বছর ধরে।

নগর দেয়ালের সাথে যে আরেকটা দুয়ার 'পোর্তা মারিনা' সেখানে রয়েছে পম্পেইর যাদুঘর। জীবন্ত পম্পেইয়ের অনেকগুলো জ্বলজ্যান্ত নিদর্শন সেখানে আমাদেরকে স্তম্ভিত করে দেয়। সবচেয়ে বেশি মনে দাগ কাটে এখানে রাখা পম্পেইবাসী মানুষ ও জীবজন্তুর প্লাস্টার কাষ্টগুলো। পম্পেইয়ের শেষ মুহূর্তগুলোকে মূর্ত করে রেখেছে ওরা। ভিসুভিয়স থেকে উত্তপ্ত ছাই আর পাথর যখন সজোরে শহরের ওপর পড়তে শুরু করেছে তখন নিঃসন্দেহে মানুষ বাঁচার চেষ্টায় ছুটাছুটি করেছে। অনেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে রাস্তার উপর—বিষাক্ত গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে মরেছে। অনেকে বাঁচবে বলে সুরক্ষিত বাড়ির ভেতরে কি তার ভূগর্ভস্থ কুঠরিতে গিয়ে ঢুকেছিল—সেখানেই তাদের কবর হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তের কিছু কিছু দৃশ্য আমাদের জন্য রক্ষিত হয়ে আছে এক অদ্ভুত উপায়ে। ধীরে ধীরে মানুষ ও জীবজন্তুর মৃতদেহ পচে মিশে গেলে এর চারদিকে শক্ত হয়ে জমা ছাইয়ের ভেতরে ওখানটায় দেহের হুবহু অনুকৃতিতে গর্তের মতো হয়ে ছিল এত শতাব্দী ধরে। ১৮৬০ সালের পরে ওখানে প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদের কাজ করছিলেন বিখ্যাত জিউসেপ্পে ফিওরেল্লি। তাঁর মাথায় বুদ্ধি আসলো এসব গর্তে তরল প্লাস্টার অব প্যারিস ঢুকিয়ে এদের ছাপ নিতে হবে। এরই ফল হিসেবে আমরা পেয়ে গেলাম যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া মানুষের, প্রাণীর হুবহু করুণ দৃশ্য। তা ছাড়া এভাবে ছাপ নেয়া গেছে বহু কাঠের আসবাবের, ব্যবহার্য জিনিসের।

দেখলাম প্লাস্টারের হুবহু প্রতিকৃতিতে মানুষগুলো মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছে, যেন দুহাত দিয়ে ঠেকাতে চাচ্ছে আগ্নেয়গিরির যাবতীয় উদ্‌গীরণকে। একটি যুবতীর সুন্দর দেহ, দুহাতের ওপর মাথা রেখে উবুর হয়ে আছে, যন্ত্রণায় কাতর অর্ধনগ্ন দেহ একেবারেই জ্বাজ্জল্যমান। অথবা ধরা যাক সেই খচ্চর চালকের দেহ, যে তার মোটা গাড়োয়ানী আলখাল্লাতে সারা গা মুড়ি দিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করছে অগ্নি বর্ষণ থেকে নিজকে বাঁচাতে। আরেকটা বাক্সে রাখা আছে গলায় শেকল দেয়া একটা কুকুরের কাষ্ট। দুর্ঘটনার সময় কুকুরটা বাঁধা ছিল জনৈক ভেসোনিয়াস প্রিমাসের বাড়ির সামনে। অগ্নি বর্ষণ যখন হচ্ছিল তখন শেকল ছিঁড়ে পালিয়ে রক্ষা পাবার জন্য তার সে কি চেষ্টা, গা মুচড়িয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, আর্তনাদের ভঙ্গিতে কি মর্মস্পর্শী দৃশ্য।

পম্পেইয়ের দৈনন্দিন জীবনের অনেক টুকিটাকি এই যাদুঘরে রয়েছে। কোন এক বাড়িতে দুপুরের যে শেষ খাবারটি টেবিলে পাতা হয়েছিল, সেই না খাওয়া খাবারের অংশ, শস্যের পোড়া দানা, ঝলসে যাওয়া রুটি—কালো হয়ে গেছে কিন্তু এখনো বোঝা যায় রুটির আকৃতি। তাছাড়া তালা চাবি, হুড়কা, দাড়িপাল্লা, কামারের যন্ত্রপাতি, ডাক্তারী সরঞ্জাম, মদ চোলাইয়ের যন্ত্র এমনি আরো বহু টুকিটাকি রয়েছে যাদুঘরে। সবচেয়ে বেশি রয়েছে অবশ্য বিভিন্ন শিল্পকর্ম—মূর্তি, চিত্র, পোড়ামাটির সুদৃশ্য পাত্র ইত্যাদি। পম্পেইয়ের বিভিন্ন ঘর-বাড়ি, মন্দির ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভবন থেকে এগুলো নিয়ে রাখা হয়েছে। সব যে দুর্ঘটনার সমকালীন তাও নয়। পম্পেই ছিল রোমানদের একটি পুরাতন এবং সমৃদ্ধ জনপদ। এরও একটা দীর্ঘ ইতিহাস ছিল, ছিল আরো শত শত বছর আগের সব ঐতিহাসিক নিদর্শন, শিল্পকর্ম। ৭৯ সালের ২৪শে আগস্ট এর সবকিছুই একসাথে ভাবীকালের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। এদের কিছু কিছু এখন রয়েছে পম্পেইয়ের বাড়িঘরে, মন্দিরে যা যেখানে ছিল। কিছু কিছু তোলা আছে পম্পেইয়ের যাদুঘরে। কিন্তু আরো বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন নিয়ে রাখা হয়েছে নেপল্‌সের প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে।



মডেস্টাসের বেকারী

আবার পম্পেইয়ের রাস্তায়। যাদুঘর থেকে বের হতেই বামদিকে পড়ে একটা তেলের ঘানি—জলপাই পিষে এখান থেকে আসতো পম্পেইবাসীদের জন্য জলপাইয়ের তেল। নাগরিক জীবনের উৎপাদন প্রক্রিয়ার আরো কিছু চিহ্ন শহরের এখানে ওখানে দেখতে পেলাম। যেমন রুটিওয়ালা মডেটাসের বেকারী। গম ভাঙার জন্য এখানে রয়েছে বড় বড় পাথরের যাঁতা। প্রত্যেকটা তৈরি হয়েছে দুটা বড় বড় পাথরের টুকরা একের উপর এক রেখে। নিচেরটা নিরেট শঙ্কুর আকারে আর উপরটা মুখামুখি দুটা ফাঁপা শঙ্কুর মতো নিচেরটাকে ঢেকে আছে। এক সময় এর উপরে ছিল ঘেরানোর অক্ষ, যার সাথে লাগনো দণ্ড ইত্যাদির সাহায্যে উপরের অংশ ঘোরানো হতো। হয়তো ক্রীতদাসরা ঘুরাতো, হয়তো বা গাধায়, কে জানে। এভাবেই ভাঙা হতো গম। পাশেই আছে রুটি সেঁকার বিশাল তন্দুর। সবই মজুদ, শুধু রুটি বানাবার আর খাবার মানুষগুলো ছাড়া। পোশাক পরিচ্ছদে ব্যবহৃত কাপড় ও বেল্ট তৈরির একটি কারখানাও দেখলাম। ঘরটা দেখে বুঝা যায়, কারখানাই ছিল। বেশ কয়টা ছবি আঁকা আছে এতে,

কারখানার কাজকর্ম দেখিয়ে। একটাতে শ্রমিকরা কাপড় সেদ্ধ করছে। আরেকটাতে এগুলো বেচাকেনার দৃশ্য।

পম্পেইয়ের অলিতে-গলিতে যতই ঘুরুন, সদর রাস্তা, আপনাকে তার প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে যাবেই। তা হলো 'ফোরাম'—মিলন কেন্দ্র, নগরের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সমস্ত যৌথ ক্রিয়াকলাপের স্থান। দেখলেই বোঝা যায় এটা মিলন কেন্দ্রই বটে। বিশাল বাঁধানো চত্বর, বেশ বোঝা যায় এক সময় এর তিন দিকই আর্কেডে ঘেরা ছিল যার অদ্ভুত সুন্দর স্তম্ভের ওপর ছিল খেলা গ্যালারি। চতুর্দিকে জুপিটারের মন্দির। ভেঙে যাওয়ার পরও স্থাপত্যের যতটুকু আছে তা ফোরমের পুরো পরিবেশটা ফুটিয়ে তুলতে যথেষ্ট। ফোরামের একদিকে ছিল গণ্যমান্য নাগরিকদের মূর্তি, অন্যদিকে বক্তৃতা দেবার মঞ্চ। আর্কেডের পর ফোরামের চারদিকে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনগুলো। ওদের মধ্যে আছে 'ব্যাসিলিকা', যেটা একদিকে যেমন বিচারকার্যের জন্য ব্যবহৃত হতো, তেমনি ব্যবসায়ীদের আলোচনা সভার কাজেও লাগতো। এর পাশেই হলো পৌর অফিস যেখানে 'ডুমভিরি' অর্থাৎ পৌর কাউন্সিল বসতো। স্পষ্ট বুঝা যায় নগরের মহাফেজখানাটাও এখানেই ছিল। সামান্য দূরে যে ভবনটি তার নাম 'কমিটিয়াম' যেখানে পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো। আর্কেডের এক প্রান্তে 'ওজন নিয়ন্ত্রণ দফতর' যা ওজনের মাপের রোমান পদ্ধতি বজায় রাখতো। ফোরামের সাথেই রয়েছে এপলোর মন্দির—বহু ধাপের উঁচু সিঁড়ি, সামনে বেদী, চারদিকে ৪৮টি স্তম্ভ, এপলোর মূর্তি। উঁচু একটি আয়োনিক ধরনের স্তম্ভের উপর রয়েছে একটা বড় সান ডায়াল—সূর্য ঘড়ি। আজকের টাউন হলে বড় ঘড়ি থাকার রেওয়াজ বহু প্রাচীনই বলতে হয়।

প্রাচীন পম্পেইয়ের ফোরামে জুপিটারের মন্দিরের পাশেই বসেছে এই নগরীতে আজকের দিনের একমাত্র ব্যবস্থাদি। একটা কাফেটেরিয়া, যেখানে দুপুরের খাবার সেরে নেয়া গেল। এখানেই রয়েছে বর্তমানের খননকার্যের কর্মকর্তাদের অফিস, তথ্যকেন্দ্র ইত্যাদি। পুরানোর মধ্যে হঠাৎ একটু আধুনিক ব্যস্ততা। চারদিকে প্রথম শতকের মধ্যে সামান্য একটুখানি বিংশ শতক।

অন্য সবকিছুর সাথে আরো একটি সার্বজনীন সার্ভিসের স্যবস্থা ছিল এই ফোরামে—তা হলো নগরবাসীদের উষ্ণ স্নানের জন্য হাম্মামখানা। এই ব্যপারটিতে রোমানরা বরাবরই বেশ আগ্রহ দেখিয়েছে। চমৎকারভাবে সংরক্ষিত আছে এটা—এর ঘরগুলোর দেয়ালে সুন্দর কারুকার্য ম্লান হয়নি এতদিন পরেও। কাপড় বদলাবার ঘরের পর একটা ঘর হলো 'ফ্রিজিডেরিয়াম, শীতল স্নানের ব্যবস্থা। তারপর 'টেপিডেরিয়াম' উষ্ণ ও শীতল কক্ষের মাঝামাঝি ঘর। এই ঘর গরম করার জন্য আগুনের আধার বা ধুনুচিটা লক্ষ্য করার মতো। তারপর 'কালিডেরিয়াম' উষ্ণ স্নানের ব্যবস্থা। এই ঘরের ডাবল-দেয়াল, দু'দেয়ালের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে গরম হওয়া চালাবার ব্যবস্থা। সবকিছুর পদ্ধতি যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক।

রোমানরা ছিল থিয়েটার অন্তপ্রাণ। পম্পেইতে দুটো থিয়েটার দেখা যায়—'বড় থিয়েটার' ও 'ছোট থিয়েটার'। বড় থিয়েটারটা দোখলাম রীতিমত বড় খোলা মঞ্চ। এর

স্থপতি পাহাড়ের ঢালের প্রাকৃতিক সুযোগটা চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন। এর গায়ে ধাপ কেটে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে—পাঁচ হাজারের মতো লোক ধরতে পারতো এটা। ছোট থিয়েটারটা ছিল আবৃত একটা মঞ্চ—হাজারখনেক লোকের জন্য। এর নির্মাণ কৌশলটা ভারি সুন্দর। দর্শকদের ধাপগুলোও প্রায় অক্ষত রয়ে গেছে।

বাসিন্দারা না থাকার একটা সুবিধা হলো শহরের যেকোন বাড়িতে ঢুকে পড়া যায়, সে যতই গণ্যমান্য লোকের বাড়ি হোক না কেন। পম্পেইর ম্যাপ ধরে, ঠিকানা নিয়ে এমনি কয়েকটি বিশিষ্ট বাড়ি দেখে নিলাম অন্দরে বাইরে। বেশ জবরদস্ত এসব বাড়ি। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, দেয়ালের চিত্রণে অপূর্ব। মূর্তিগুলো প্রধানত মার্বেল আর ব্রোঞ্জের। দেয়ালে দেয়ালে মুর‍্যাল চিত্র, কুচি পাথরের মোজেক চিত্র। দেয়ালের ফ্রেসকো চিত্রগুলো চুনের প্লাস্টারের উপর জলরঙে করা। টেম্পেরা পদ্ধতির উজ্জ্বল রঙের চিত্রও প্রচুর। এতে রঙের গুঁড়ো আঠালো জিনিসে মিশিয়ে তাতে ডিমের কুসুম ও মোম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেয়ালের উপর হলুদ, কালো, সবুজ বা নীল রঙের একটা এক রঙা পটভূমি বানিয়ে তার উপর আঁকা হয়েছে। বেশির ভাগ ঔজ্জ্বল্য এবং প্রাণবন্ততা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। মূর্তি ও চিত্রের বিষয়বস্তু বহুবিধ। প্রধানত নানা পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী। আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাও রয়েছে। আবার বাড়ির মালিকের আপনজনের ছবি, সমসাময়িক টুকিটাকিও আছে। বাড়িগুলোর বাইরের দিকটা বেশ রাখা-ঢাকা হলেও ভেতরে বাগান, মূর্তি চিত্রিত ঘরগুলো বড় সৌখিন রুচির পরিচয় দেয়। বৈঠকখানা, বারান্দা, ভেতরের বাগান, রান্নাঘর, বিভিন্ন শোয়ার ঘর সবকিছু সুপরিকল্পিত।

পম্পেইয়ের অনেকগুলো বাড়ি দর্শকদের কাছে বিশিষ্ট—হয় বাড়ির কারণে, নয়তো তাদের মালিকদের কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে। আজকাল বাড়িগুলোর নামও তাই হয়েছে বাড়ির কোন একটা কিছুর নামে অথবা মালিকের নামে। 'নোঙ্গরের বাড়ি' বলে পরিচিত যেটা তার প্রবেশপথের মোজেক চিত্রে নোঙ্গরের ছবি, তাই এই নাম। 'ট্রাজিক কবির বাড়ি', 'এপলোর বাড়ি' 'অর্ফিয়াসের বাড়ি'—ইত্যাদি বহু বাড়ি কোন ছবি বা কোন মূর্তির কারণে। আবার 'সার্জনের বাড়ি' 'ভেট্টির বাড়ি' প্রভৃতি বাড়ির শেষে মালিকের নামে। মালিকের নাম বের করা সব সময় কঠিন হয়নি। যেমন 'গিউলিয়া ফেলিসের' বাড়ি বলে যেটা পরিচিত তার প্রবেশ পথে একটা 'ভাড়াটে চাই' বিজ্ঞাপন আছে যার নিচে মালিক ভদ্রমহিলার নাম দিয়ে দেয়া হয়েছে।

ঘুরে ফিরে আবার ফোরামের চত্বরে এসে বসলাম। অনুভব করতে চেষ্টা করলাম সেদিনের পম্পেইকে। এখান থেকে জুপিটারের মন্দিরের স্তম্ভগুলোর উপর দিয়ে তাকালেই সামনে সেই ভিসুভিয়স, তার সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যার জন্য সেদিনের পম্পেই বিলুপ্ত হয়েছে, যার জন্য আজকের পম্পেই আবার আমাদের কাছে হুবহু উঠে আসতে পেরেছে, মরে অমরত্ব লাভ করেছে পম্পেইবাসী, তাদের ঘরবাড়ি, মন্দির, চত্বর সবকিছু। ৭৯ খ্রিস্টাব্দের সেই বিখ্যাত উদ্গীরণের পর ভিসুভিয়স সময়ে সময়ে আরো বহুবার ফুঁসে উঠেছে, কিন্তু সেগুলো তেমন করে স্মর্তব্য নয়। শেষবার এটা ফুসে উঠেছিল ১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ ভাল রকম উদ্গীরণ হয়েছিল সেবার। ত্রিশ ফুট

গভীর লাভাস্রোত ধ্বংস করেছিল অনেক চাষের ক্ষেত, রাস্তা-ঘাট, দুটা পুরো গ্রাম, গৃহহারা করেছিল পাঁচ হাজার গ্রামবাসীকে। কিন্তু ৭৯ সালের মতো আর হয়নি কিছু। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ভিসুভিয়স শান্ত। পম্পেইয়ের ফোরামে বসে ভিসুভিয়সের সেই সৌম্য মূর্তি দেখলে কে বলবে তার ভেতর এত আগুন।

এমন কিছু উঁচু নয় ভিসুভিয়স—চার হাজার দু'শ ফুট মাত্র। মোটরের রাস্তা চলে গেছে এর ওপর। ওপর থেকে নেপলস উপসাগর, নেপলস শহর, অদূরে ছবির মতো সুন্দর বিখ্যাত দ্বীপগুলো ক্যাপ্রি, ইসকিয়া,ভিভারা, প্রসিডা—এসব অত্যন্ত চমৎকার দেখায়। একেবারে জ্বালামুখের কিনারায় চলে যাওয়া যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালে সোজা এক হাজার ফুট নিচে নেমে গেছে জ্বালামুখ—এটা দু হাজার ফুট প্রশস্ত। চীৎকার করলে এর দেয়ালে সুন্দর প্রতিধ্বনিত হয়ে আসে শব্দ। কিন্তু জ্বালামুখের সেই জ্বালার তেমন কোন চিহ্ন আজ নেই, সবই সুন্দর, সবই স্নিগ্ধ। তবে এই সবকিছুই হয়তো সাময়িক। যে-কোন দিন আবার ফুঁসে উঠতে পারে ভিসুভিয়স। সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে আশেপাশের সব মানুষকে।

পম্পেইয়ের সন্ধ্যা গাঢ় হলো। জুপিটরের মন্দিরের ওপর ভিসুভিয়স আঁধারে মিলিয়ে গেল। এবার ফেরার পালা। রাতের পম্পেইয়ের দোকানগুলোতে আজ আর বাতি জ্বলে না, বড় থিয়েটার ছোট থিয়েটারে নাটক জমে ওঠে না, নাচের হুল্লোড় পড়ে না বাড়ির বড় ঘরে। কিন্তু পম্পেইয়ের প্রাচীন দেয়াল অতিক্রম করে উনিশ শ' বছর পরের জগতে আসতেই আবার সব কিছু জমজমাট। মানুষের ব্যস্ততা আর সুখ-দুঃখে কিই-বা তফাত ঘটেছে এর মধ্যে? পম্পেই রেল স্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছিল। একদল স্কুলের ছেলেমেয়ে খুব হুল্লোড় করছিল। উত্তর ইতালি থেকে এসেছে, পম্পেই দেখতে। আলাপ হলো, অবোধ্য ভাষায় এরা দল বেঁধে গাইলো একের পর এক গান, হাসিতে গড়াগড়ি খেল। উনিশ শ' বছর—মানুষের হাসি-কান্নায় কি-বা তফাত হয়েছে এর মধ্যে? কিছুই না।



অস্ট্রেলিয়ার অভয়ারণ্য

অল্প দিনের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় এলেও এর মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার সেই অদ্ভুত আলাদা প্রাণী জগতের সাথে খানিকটা পরিচিত না হলে চলবে কেন?—ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা, প্লাটিপাস আর কালো রাজহাঁসের সেই জগত। সংক্ষেপে এটা সম্ভব অভয়ারণ্যে গিয়ে। মেলবোর্ন নগরীর মাইল পঁচিশেক দূরেই রয়েছে এমনি একটি অভয়ারণ্য—হিলসভিল স্যাংকচুয়ারি। কাজেই পাড়ি দেবার প্রয়োজন নেই হাজার হাজার মাইলের বিস্তৃত মহাদেশের অরণ্য, তৃণভূমি আর মরুভূমির এপার ওপার—অস্ট্রেলীয় প্রাণীকুলের সন্ধানে। গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের ভ্রমণের পরেই চলে আসা গেল তাদের এক নিজস্ব বাসভূমে, যেখানে মোটামুটি প্রাকৃতিক পরিবেশে কিন্তু সীমিত জায়গায় রাখা আছে এই মহাদেশের ব্যতিক্রমী সব পশু আর পাখিদের।

প্রাণীতাত্ত্বিক ভূগোলের হিসাবে পৃথিবীকে কয়েকটি মূল অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে—ইউরেশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, দুই আমেরিকা এবং অস্ট্রেলেশিয়া। শেষোক্ত অঞ্চলটি সবচেয়ে ছোট এবং অধিকাংশ অংশে শুষ্ক ও জীবন-যাপনের জন্য কঠিন আবাস। অথচ এই অনুপযোগী অঞ্চলেই রয়ে গেছে সবচেয়ে ব্যতিক্রমী বন্য প্রাণীর এক অদ্ভুত সমারোহ। সমুদ্র দিয়ে চারিদিকে বেষ্টিত এর একান্ত অবস্থানে বিবর্তিত হয়েছে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক প্রাণীকুল—অন্যান্য অঞ্চলের বির্বতনের সাথে সম্পর্কহীন থেকে।

হিল্‌সভিল অভয়ারণ্যের গাছপালার পরিবেশ ও অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব উদ্ভিদ বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। সর্বত্র ইউক্যালিপ্‌টাসের ছড়াছড়ি। এটাই অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে মুখ্য বৃক্ষ—এর ছয়শত বিভিন্ন প্রজাতি এখানে রয়েছে। ইউক্যলিপ্‌টাসের বিচিত্র বাকলেই এর বৈশিষ্ট্য—কোনটা চকচকে মসৃণ, কোনটা খসখসে, কোনটা শক্ত আঁশটে, কোনটা গভীর সব দাগে কলংকিত। এদের

অধিকাংশের বাকল আবার প্রায়ই ঝরে পড়ে, আবার গজায়। কোনটা ঝরে ছোট ছোট টুকরার আকারে, কোনটা ফিতার আকারে, কোনটা বড় বড় বোর্ডের আকারে ঝরে। আবার এই শুকনা ঝরা বাকল অস্ট্রেলিয়ার ভয়ংকর সব দাবানল বিস্তৃত হতে ইন্ধন যোগায়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাণী বলতেই প্রথম যাদের খুঁজে নিতে হয় তারা হলো বাচ্চা রাখার থলেওয়ালা প্রাণী—জীববিদরা যাদের বলেন মারস্যুপিয়াল। এদের একটিকে আমরা খুব চিনি—সে ক্যাঙ্গারু—বলতে গেলে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রতীক সে। কিন্তু আসলে এ দেশে নানা বিচিত্র রকমের মারস্যুপিয়াল রয়েছে—মোট ১৭৫ রকমের। এর মধ্যে ক্যাঙ্গারু ও কোয়ালার মত সুপরিচিত তৃণভোজীরা যেমন রয়েছে, তেমনি আছে তীক্ষ্ণদন্ত ইঁদুরের মত ছোট মাংসাশীরা। আবার রয়েছে, বিড়াল বা নেকড়ে বাঘের মত মাংসাশীরা। এদের মধ্যে মিল শুধু একটি জায়গাতেই প্রত্যেকের রয়েছে সন্তানকে আশ্রয় দেবার মত থলে। অস্ট্রেলিয়ায় এত রকমের এত বিচিত্র প্রাণী কেমন করে যে এরকম থলি ধারণ করার মত হয়ে বিবর্তিত হলো সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

ঐ যে বড় লাল ক্যাঙ্গারুর একটি দল। সবই প্রায় আলস্যভরে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে—স্ত্রী-পুরুষ ছেলে বুড়ো সবই। বেশ খানিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো এদের দু'একটিকে মোটা লেজ আর পেছনের পায়ে ভর করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে চলতে দেখতে। নাম লাল ক্যাঙ্গারু হলেও এদের পুরুষগুলোই শুধু লাল, স্ত্রীগুলো অনেকটা ধূসর। মা ক্যাঙ্গারু ঘাস খাচ্ছে, আর তার পেটের থলেতে দিব্যি বসে বেশ বড় সড় একটা বাচ্চা মুখ বের করে—সেও ঘাস খাচ্ছে মাটিতে মুখ নুইয়ে মায়ের ঝুকে পড়ার সুযোগ নিয়ে। আসলে বনের মধ্যে ডিঙ্গো কুকুর আর ভীষণ স্বভাব ঈগলের উপদ্রব এত বেশি যে বাচ্চারা রীতিমত বড় ও আত্মরক্ষায় সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত ঐ থলে থেকে বের হয়ে বেশি দূর যায় না। ঐ বড় ঘাস খাওয়া বাচ্চাটি কিছুক্ষণ থলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল কাছাকাছি। হঠাৎ সামনের ছোট্ট দুপায়ের একটিকে হাতের মত ব্যবহার করে মায়ের তলপেটের থলেটা একটু খুলে নিল ঢোকার প্রস্তুতি হিসাবে। মাথটা আগে বাড়িয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল থলের মধ্যে, তারপর ওর ভেতরেই নিজকে ঘুরিয়ে নিল মাথা সামনের দিকে আনার জন্য। এত বড় বাচ্চার ওজন বহন করে মা ক্যাঙ্গারু যেমনভাবে চললো তা দেখার মত।

এর কয়েকদিন আগে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (সি. এস. আই. আর. ও) জন সংযোগ বিভাগের নির্মিত একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র দেখেছিলাম, নাম—'একটি লাল ক্যাঙ্গারুর জন্ম'। ছবিটা বিশ্বব্যাপী নাম করেছে অত্যন্ত খুঁটিনাটিতে গিয়ে এর চমৎকার চিত্রগ্রহণের জন্য। নানা কারণে ক্যাঙ্গারুর এই জন্ম-চিত্রটি খুবই ব্যতিক্রমী। বাচ্চার জন্ম লগ্ন কাছিয়ে আসলে মা ক্যাঙ্গারু যেভাবে তার থলেটা ঝাড় পোছ করে পরিষ্কার করে তোলে তাতেই তা বোঝা যায়। অন্যান্য স্তন্যপায়ীর তুলনায় এই নবজাত বাচ্চাটি কিন্তু নেহাতই বাচ্চা থাকে। ২০০ পাউন্ড পর্যন্ত ওজনের বড়সড় এই প্রাণীর বাচ্চাটি থাকে জন্ম লগ্নে লাল টুকটুকে ছোট্ট একটি অসহায় পোকার মত—লম্বায় এক ইঞ্চির কম, ওজনে এক আউন্সের

পঁয়ত্রিশ ভাগের একভাগ! মায়ের ওজনের ত্রিশ হাজার ভাগের মত! জন্মের পর মায়ের নাড়ীর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এই ছোট্ট প্রাণীটি যাত্রা শুরু করে ভবিষ্যতের বহুদিনের আশ্রয় সেই থলেটার দিকে। পোকা সদৃশ বাচ্চাটার তখন ক্যাঙ্গারুর সাথে কোন সাদৃশ্য নেই—লোমহীন, অন্ধ, অসহায়। কিন্তু এ অবস্থাতেই সামনের পায়ের নখ আর বংশগতি নির্ধারিত নির্দেশে সে ঠিকই অতিক্রম করে যায় মায়ের লোমরাশির মধ্য দিয়ে ছয় ইঞ্চির মত পথ—থলের মুখ পর্যন্ত। সেখানে দুধের একটি বাট মুখে দিয়ে সে পরবর্তী ছয় মাস তার সাথে সংযুক্ত থাকে। ছয় মাস পর খানিকটা স্বাধীন হলেও মায়ের থলেতে তার নিরাপদ অবস্থান আরো বহুদিনের জন্য।



ইউক্যালিপটাস গাছের ডালে বসে যে কোয়ালাটা নিশ্চিন্ত মনে পাতা চিবুচ্ছে—তাকে খুঁজে পেতে বেশ সময় লাগলো বৈকি! একেবারেই নির্লিপ্ত, অতি ধীরে, মনে হয় ঘুমের মধ্যেই চিবুচ্ছে পাতা। পিঠের উপর বাচ্চাটি গুটিসুটি মেরে বসে আছে—তারও নট নড়ন চড়ন। মাঝে মাঝে মায়ের পিঠ থেকে নেমে একটু এদিক-ওদিক যাচ্ছে, অদ্ভুতভাবে নাকটাকে নাচালো যেন নাকে সুড়সুড়ি লাগছে আর চোখগুলো ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে আমাদের দিকে। আবার ভয় পেয়ে গিয়ে মায়ের পিঠে চড়ে বসলো। ইউক্যালিপ্‌টাস পাতাই কোয়ালার একমাত্র খাদ্য। তার শরীরের সমস্ত প্রয়োজন মেটে ঐ পাতা থেকে। অন্য কিছু এমন কি পানিও সে খায়না। তার পরিপাক যন্ত্র ঐ তৈলাক্ত পাতা থেকেই সব নিষ্কাশিত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি। আসলে তার পুরো জীবনযাত্রাটাই ঐ খাদ্যাভ্যাসের সাথে জড়িত। ছোটখাট ভালুকের মত চেহারা। কেমন যেন গোবেচারা ভাব। এও মারস্যুপিয়ালে—বাচ্চা থাকে থলের ভেতরে পাকা ছয় মাস। আরো মাস তিনেক সে কাটায় মায়ের পিঠে চড়ে, সব সময় কাছাকাছি থেকে। তার এই অলস, উদাসীন স্বভাবের কারণে কোয়ালার বংশ প্রায় লোপ পেতে চলেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে অস্ট্রেলিয়ার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় এটা রক্ষা পেয়ে গেছে।

কোয়ালার মতই প্রায় দেখতে তার জাত ভাই ওমবাটটা কিন্তু মাটির কাছে থাকা প্রাণী। ওকে দেখা গেল তার শক্ত নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে শিকড় খুঁজতে। ওটাই তার খাদ্য।

একটু খোলামেলা জায়গায় গিয়ে সাক্ষাৎ মিললো আরো নানা জাতের ক্যাঙ্গারুর। ক্যঙ্গারু জাতীয় প্রাণীর যে এত বৈচিত্র্য আছে তা আগে জানা ছিল না। কতগুলো সেই লাল ক্যাঙ্গারুর কাছাকাছি আকারের কিন্তু বেশ ছোট—চেহারায়ও খুব বেশি অসাদৃশ্য নেই পরিচিত ক্যাঙ্গারুর সাথে। এরা ওয়ালাবী নামে নামে পরিচিত। বেশ লোমশ কিছু ক্যাঙ্গারু দেখা গেল—এরা ওয়ালারু। আবার কিছু ক্যাঙ্গারু এক্কেবারে ইঁদুরের মত—বলা হয় ইঁদুর ক্যঙ্গারু। আসলে অষ্টেলিয়ার বিচিত্র ভূ-প্রকৃতির তাল মিলাতে গিয়ে একই ক্যাঙ্গারু এই বিচিত্র আকার আকৃতি লাভ করেছে। দেখলাম এদের অধিকাংশই কিন্তু মোটামুটি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন, কাছে কাছে ঘুর ঘুর করছে, আলুর চিপস ইত্যাদি দিলে বেশ মজা করে খাচ্ছে, আরো দেয়ার জন্য ধাক্কা দিচ্ছে। নিরীহ সুন্দর জীব। কিন্তু ফসল খেয়ে নাকি কৃষকদের মেলা বিপত্তি ঘটায় এরা।

অভয়ারণ্যে কোন বানর ছিল না—অস্ট্রেলিয়ার কোথাও কোন বানর নেই। কিন্তু বাঁদরামী করার প্রাণীর অভাব ওখানে ছিল না! এই বাঁদরামীর ভার ওখানে নিয়েছে পোস্‌সাম গোষ্ঠীর প্রাণীরা। গাছের উপর, শাখা থেকে শাখায় খুব দাপাদাপি করতে দেখা গেল এদের, কিন্তু ঠিক বুঝা গেল না কোনটা কি রকম।

অস্ট্রেলিয়া যে অদ্ভুত প্রাণীর মহাদেশ সে কথাটি বোধ হয় সবচেয়ে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার একটি প্রাণীর মধ্যে—তা প্লাটিপ্লাস। হীল্‌সভীল অভয়ারণ্যে একটি সুন্দর কেন্দ্র শুধু এই প্লাটিপ্লাসকে নিয়ে। উষ্ণ রক্তের লোমশ এই প্রাণী স্তন্যপায়ীর মতই বাচ্চাকে দুধ দেয়। অথচ এটা টিকটিকির মত ডিম পাড়ে আর পানির তলা থেকে খাবার তুলে আনে ঠেক হাঁসের মত। ঠোঁট, পা সহ চেহারাটাও হাঁসের মতই। প্লাটিপ্লাসের এই কেন্দ্রে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে তার জীবন কাহিনী। নদীর পারে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ খুঁড়ে কেমন করে সে ইউক্যালিপ্‌টাস পাতার নরম বাসা তৈরি করে। সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথটি পানির খুব কাছাকাছি থাকে। অবাঞ্ছিতদের বিভ্রান্ত করার জনন্য সুড়ঙ্গে বহু ভুল কানাগলিও থাকে। দেড়শ বছর আগে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা প্রথম যখন প্লাটিপ্লাসের কথা শোনেন তখন তাঁরা তা বিশ্বাসই করতে চাননি—অংশত সরীসৃপ, অংশত স্তন্যপায়ী আর অংশত পাখি এই অদ্ভুত যৌগিক প্রাণীকে। এর মোটা চেপ্টা লেজ সাঁতারে যেভাবে সাহায্য করে তা ধীবরের মত, এর রয়েছে সাপের ফণার মত বিষ পেছনের পায়ের সাথে, ভোঁদড়ের মত ছেরা সামনের পা সাঁতার কাটার জন্য, কাঁধের হাঁড় সরীসৃপের মত ইত্যাদি বহুতরো সমন্বয়। জানা মতে সাতটি মাত্র প্লাটিপ্লাসকে অস্ট্রেলিয়ার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত—এদের কোনটিই এখন বেঁচে নেই। ভবিষ্যতে এখান থেকে কোন প্লাটিপ্লাস রফতানির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

অস্ট্রেলিয় সরকার এই বিশেষ প্রাণীটির সংরক্ষণে অত্যন্ত তৎপর। প্লাটিপ্লাসের সমগোত্রীয় আরো কিছু প্রাণী হলো সজারুর মত কাঁটাওয়ালা এখানকার পিপীলিকাভূকগুলো। অভয়ারণ্যে নানা দিক থেকে চিহ্ন দেয়া ছিল যে এইখানে এই দিকে রয়েছে টাসমেনিয়ান ডেভিলের বাসা। নাম যখন ডেভিল বা শয়তান, ভাবলাম কি

ভয়ংকর না এ জন্তু হবে। কিন্তু আসলে ছোটখাট নাদুস-নুদুস এই কুকুর সদৃশ জন্তুটাকে বেশ নির্দোষ বলেই মনে হয়। ডাল-পাতায় তৈরি তার বাসায় মাথাটা বের করে দিয়ে সে নিরীহের মত তাকিয়ে ছিল। এটা অবশ্য মাংসাশী প্রাণী, ছোট ইঁদুর, ক্যাঙ্গারু, টিকটিকি, ব্যাঙ, পাখি—এগুলো ধরে খায়। অভয়ারণ্যে এর কদরের কারণ হলো এই প্রাণীটির সংখ্যা এখন খুবই কম, বলতে গেলে বিলুপ্তির আশংকায় রয়েছে এটা।

এত বিচিত্র রকমের পাখিও আর কোথাও দেখা যায় না। অবশ্যই অভয়ারণ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে বিশালদেহী এমু পাখিগুলো। ইউক্যালিপ্‌টাসের ফাঁকে ফাঁকে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে পাঁচ ফুট উচ্চতার এ পাখি—আমাদের চেয়ে তেমন কিছু বেঁটে নয়। এমু যে সর্বভুক প্রাণী তার প্রমাণ হাতে নাতে পাওয়া গেল। সাধারণত এরা ঘাস খেয়ে বাঁচে বটে, কিন্তু যাই দিলাম তাই খেল—রুটি, স্যান্ডউইচ, মাছ, ফল-ফলারি—সবকিছু। কিছু বাচ্চাও দেখা গেল সাথে। মজার ব্যাপার হলো এমু পাখির ডিমে তা দেয়ার ভার নাকি বাবা পাখির, মা পাখির নয়। ওরা খুবই যত্নে দীর্ঘ আট সপ্তাহ ধরে এক মনে এই কাজ করে যায়—মা এমুর তখন কোন কাজ নেই। অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু পাখির এই নিয়ম।

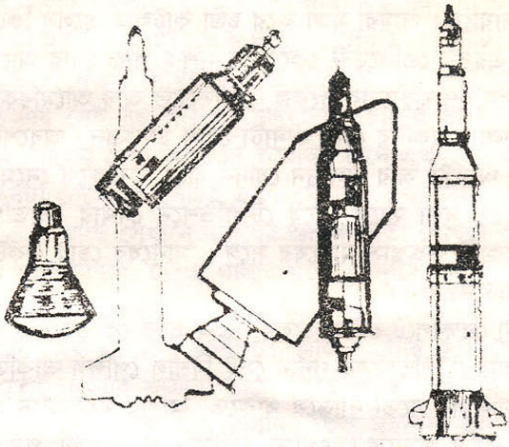
অস্ট্রেলিয়াকে 'তোতা পাখির দেশ' বলা হতো এক সময়। কত বিচিত্র রকমের তোতা যে দেখা গেল! বহু রকমের কাকাতুয়াই রয়েছে যেগুলো তার মোটা ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁড়ে শিকড় বের করে, অথবা কাঠ-ঠোকরার মত গাছের বাকল ঠুকরিয়ে ছেড়ে। এদের রং আর সাজ-সজ্জার বাহার দেখার মত। অভয়ারণ্যে বড় বড় এক একটা অঞ্চল এদের জন্য জাল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে। এমনি একটা জায়গা আলাদা করে রাখা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত গায়ক পাখি লায়ার বার্ডের জন্য। পুরুষ লায়ার বার্ডের দুই ফুট লম্বা সুন্দর বাঁকানো পুচ্ছের সমারোহ অনেকটা প্রাচীন লায়ার বীণা যন্ত্রের মত দেখতে। গাছপালার ফাঁকে তাকে খুঁজে নিতে বেগ পেতে হলো না। এ পাখির সঙ্গীত-পারদর্শিতা কিন্তু অতুলনীয়। সঙ্গীনীকে আকর্ষণের জন্য পুচ্ছের পেখম মেলে নাচার সাথে সাথে ও তার নিজস্ব সুন্দর সুরে গান ধরে। কিন্তু তা ছাড়াও অন্যের গান নকল করতেও এর জুড়ি নেই। অন্যান্য নানা রকমর পাখির বিচিত্র স্বর ও গান এর গলায় শোনা যায়। ওরকম পরিবেশে থাকলে এরা নাকি যন্ত্রপাতির শব্দ, মোটর গাড়ির হর্ন—এ সবও নকল করতে পারে।

আর একটা অদ্ভুত পাখি কুকাবুরা—দেখতে অনেকটা বড় মাছরাঙার মত। এরা কয়েকটা মিলে একত্র হয়ে এমন আওয়াজ তোলে যা শুনতে আট্টহাসির মত মনে হয়। ঐ গায়ক লায়ার বার্ড় কিনা এমন অট্টহাসিও সুন্দর নকল করতে পারে। রাজহাঁস কালো হতে কবে কে শুনেছে? কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় তাও সম্ভব। বড় বড় পুকুরে দিব্যি সাঁতারে বেড়াচ্ছে এমনি কালো রাজ হাঁসের জোড়া সাথে ছোট ছোট বাচ্চা। কাল রাঁজহাসের একমাত্র প্রাকৃতিক আবাস অস্ট্রেলিয়া।

বন মোরগের মত একটা পাখির দেখা মিললো অভয়ারণ্যে যার খ্যাতি তার রূপে নয়, বরং তার গুণে। এর নাম মালী ফাউল। এরা ডিম পাড়ে মাটি আর পচা পাতা ইত্যাদির কম্পোস্টের একটা ডিবির ভেতরে। ডিম পাড়া হয়ে গেলে পুরুষ পাখি ডিম

ফুটাবার জন্য সে ডিবির মধ্যকার উত্তাপকে ৯০ থেকে ৯৬ ফারেনহাইটে রাখার চেষ্টা করে যায়—আরো মাটি জমিয়ে বা কিছু মাটি তুলে ফেলে। তা ছাড়া পাতা পচার ফলে উৎপন্ন তাপ নিয়ন্ত্রণ করেও সে এটা করে। এ রকম নিয়ন্ত্রণের জন্য থার্মোমিটারের তো প্রয়োজন! মালী পাখির থার্মোমিটার হলো তার ঠোঁট। কিছুক্ষণ পর পর তার আধ খোলা ঠোঁট ডিবির ভেতর গুঁজে দিয়ে সে বুঝতে পারে সঠিক উত্তাপ প্রয়োজনের বেশি না কম। রীতিমত একজন কুশলী নার্সের ভঙ্গিতে উত্তাপ নিতে থাকে পুরুষ মালী ফাউল! যথাসময়ে ডিম ফুটে বের হবার পর বাচ্চাকে ঐ ডিবির মাটি-পাতা ভেদ করে উঠতে হয়।

হীলস্‌ভীল অভয়ারণ্যে যেভাবে পুরো অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিচিত্র প্রাণিকুলকে প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখা হয়েছে তা নিজের প্রাণী-সম্পদের প্রতি ওদেশের মমত্বকে প্রমাণ করে। কি অদ্ভুত যত্নে ওরা বিলুপ্তপ্রায় মূল্যবান প্রজাতিকে আবার জীইয়ে তুলেছে তা দেখলে অবাক হাতে হয়। তা ছাড়া বিশাল এই দেশের বিচিত্র সব প্রাণীকে এভাবে এক সাথে খোলামেলা পাওয়া সে কি কম সুযোগ?



হান্টসভিল আলাবামা

আলাবামা নামটির সাথে এক সময় বর্ণবাদের, নিগ্রো নির্যাতনের কথাটিই কেন জানি মনের মধ্যে বড় বেশি গাথা ছিল। অথচ এখন হান্টাসভিল আলাবামা বললে অন্য একটা অভিজ্ঞতা মনে আসে। এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত, উদার এক বিস্তৃত পটভূমির—সেটা মহাশূন্যের। ঐ শহরে রয়েছে আমেরিকার স্পেস মিউজিয়াম—ওখানে গিয়ে মূর্তিমান দেখতে পেয়েছিলাম এমন সব জিনিস, এমন সব ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন যা এক একবার সারা দুনিয়াকে চঞ্চল করেছে। আমেরিকার সুদূর দক্ষিণে এক খণ্ড জমিতে এই মিউজিয়াম। অথচ ওখানটায় এমন সব জিনিস রাখা আছে যারা একদিন বিস্তৃত হয়েছিল উন্মুক্ত মহাশূন্যে, ঘুরে এসেছিল পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে চাঁদের কাছাকাছি থেকে। মানুষের একটি প্রয়াসের কথা সেখানে প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে—যে প্রয়াস অনন্য।

নিজের কাছেও এসব অভিজ্ঞতা একদিনের ছিল না। আমাদের পুরো কৈশোর কালটা কেটেছিল মহাশূন্যে নিত্যনতুন অ্যাডভেঞ্চারের চাঞ্চল্যকর সব খবরের মধ্য দিয়ে। এখনো বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা এপ্রিলের খবরটি—সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর চারদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে একটি কৃত্রিম চাঁদ, 'স্পুটনিক' শব্দটা তখন আমাদের মুখে মুখে। তারপর কুকুর লাইকা—একের পর এক আরো লুনা, ভোস্টক, রেঞ্জার, মারিনার কত কি! একষট্টি সনের এপ্রিল—ইউরি গ্যগারিন, দুনিয়ার প্রথম মানুষ মহাশূন্যে পৃথিবীকে চক্কর দিয়ে নিরাপদে ফিরে এসেছেন; মানুষের বিরাট সাফল্য। রাশিয়ার এ সব সাফল্য আমেরিকাকে মরিয়া করে তুলেছে। এই অদ্ভুত দৌড় প্রতিযোগিতাও আমরা কম উপভোগ করছিলাম না।

ঐ একষট্টির মে মাসেই আমেরিকান এলেন শেফার্ড মহাশূন্যে ঘুরে এলেনও, কিন্তু মাত্র অর্ধেকটা চক্কর। পরের বছর ফেব্রুয়ারিতেই জন গ্লেন পুরাপুরি পৃথিবী চক্কর দিলেন ফ্রেন্ডশিপ মহাশূন্যযানে। আমরা মজা করে ছড়া কাটলাম এলেন ফিরে এলেন, গেলেন এবার গেলেন। এরপর প্রেসিডেন্ট কেনেডির দশক পার হবার আগেই চাঁদে একজন আমেরিকানকে পদার্পণ করানোর সংকল্প, সোভিয়েত আর আমেরিকায় পর পর নতুন নতুন দিকে সাফল্য—একটার চেয়ে অন্যটা বেশি চমকপ্রদ। অবশেষে দশকটির প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন যেদিন ধীরে পদক্ষেপে নেমে এলেন মই বেয়ে চাঁদের মাটিতে, সে দৃশ্য সাথে সাথে টেলিভিশনে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল সারা দুনিয়ার কোটি কোটি রুদ্ধশ্বাস মানুষের সঙ্গে। 'মানুষের ছোট্ট একটা পদক্ষেপ, কিন্তু মানবজাতির বিরাট উল্লম্ফন।'

এমনি একটা প্রেক্ষাপটে হান্টসভিলের সংগ্রহ প্রচুর কৌতুহলের সৃষ্টি করতে বাধ্য। বইয়ের পাতায় আর টেলিভিশনের পর্দায় সেই বিশাল পেন্সিল আকৃতির রকেটগুলোকে কত দেখেছি জগদ্দলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে, আবার মহাগর্জনে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি করে মহাকাশে পাড়ি জমাতে। এখানে হান্টসভিলে ওগুলো পূর্ণ অবয়বে দাঁড়িয়ে আছে—রেডস্টোন, এটলাস, টিটান, স্যাটার্ন—প্রথম দিকের কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে শুরু করে চাঁদে অভিযানকারী মানুষকে যারা নিজেদের প্রচণ্ড শক্তিতে তুলে দিয়েছে। রকেটগুলোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালে তবেই বোঝা যায় কত প্রকাণ্ড এর আকার। অর্ধকক্ষে পরিভ্রমণের জন্য এলেন শেফার্ডকে যে রকেট নিয়ে গিয়েছিল সেই রেডস্টোন বলতে গেলে এদের মধ্যে প্রথম যুগের—তুলনামূলকভাবে ছিমছাম, ছোট। রেডস্টোন থেকে বিভিন্ন এটলাস ও জেমিনী মিশরে টিটান পর্যন্ত রকেটগুলো উচ্চতায় প্রায় সমান—একশ ফুটের কোঠায়। সেই তুলনায় স্যাটার্ন রকেটগুলোকে বলা যায় দৈত্যাকার। একেবারে শেষেরটা এপলোর সাটার্নতো স্তরে স্তরে উঠে গেছে সাড়ে তিনশ ফুটেরও বেশি—বপুটাও তার প্রকাণ্ড।

বিশাল আকারের জন্য রকেটগুলোকে ঠিক মানবিক সম্পর্কে সম্পর্কিত করতে পারছিলাম না। কিন্তু মিউজিয়াম ঘরের ভেতরে মহাকাশ যাত্রার সত্যিকার স্মৃতিচিহ্নগুলো দেখে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। এক জায়গায় রাখা আছে সেই মার্কারী ক্যাপসুলটি যার মধ্যে বসে ১৯৬২ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারি জন গ্লেন মহাশূন্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসেছেন। অপেক্ষাকৃত ছোট, দুর্বল এটলাস রকেটের মাথায় চেপে উঠতে হয়েছিল একে। আকারে বহরে তাই নিতান্ত ছোট। ভাবতে অবাক লাগে এর মধ্যে গ্লেন এতক্ষণ কাটিয়েছিলেন কিভাবে? ক্যাপসুলের ওপর ভাগ সম্পূর্ণ রঙচটা—খানিকটা বিধ্বস্ত চেহারা, যদিও আগাগোড়াই এক অবয়ব অটুট আছে। চেহারা এ রকম হবেই না কেন। পৃথিবী চক্কর দিয়ে এসে ফিরতি পথে বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় একে যে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার চিহ্ন যাবে কোথায়? বায়ুর ঘর্ষণে যে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা সহ্য করার মতো করেই অবশ্য ক্যাপসুলগুলো তৈরি। জানালার ভেতরের যন্ত্রপাতি, বসার ব্যবস্থা সব নজরে পড়ে।

আরো কিছু ক্যাপসুল রাখা আছে প্রধানত মার্কারী আর জেমিনী মিশনসমূহের। মহাশূন্যের পোশাক এবং আরো নানান টুকিটাকি তো রয়েছেই।

মিউজিয়ামের একটি খোলাঙ্গনে খানিকটা জায়গাকে আলাদা করে সেখানে সৃষ্টি করা হয়েছে হুবহু চাঁদের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য। চাঁদের মতো মাটি, চন্দ্রশিলার মতো ছোট বড় পাথরে ভর্তি, গর্ত জ্বালামুখের প্রান্ত সবই আছে। এরই এক খানে দাঁড়িয়ে আছে এপলো-১১-এর সেই বহু পরিচিত চন্দ্রযানটি, চাঁদের সী অব ট্রানকুইলিটিতে ১৬ই জুলাই ১৯৬৯ সালের যেটা অবতরণ করেছিল চাঁদে প্রথম মানুষকে সাথে নিয়ে। না, ঠিক চাঁদের যেটা নেমেছিল সেটিই নয়। সেটার বেশির ভাগ তো চাঁদেই থেকে গেছে, এখনো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে মানুষের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। এটি একটা মডেল, একেবারে হুবহু মডেল, চ্যাপ্টা থালার মতো জিনিসে ভর করে তিনটা পায়ার ওপর দাঁড়ানো চাঁদের বুকে চন্দ্রযান।

মহাশূন্য যাত্রার চমক লাগানো খবরগুলো আজ সংখ্যায় কমে গেছে। তার একটি কারণ হলো এপলো-১৫-এর যাত্রীরা চাঁদে গিয়ে গাড়ি চালাবার পর আর মানুষ মহাশূন্যে কোন লক্ষ্যস্থানে নিজে আর যায়নি। কিন্তু মহাশূন্য মানুষের অ্যাডভেঞ্চার শেষ হয়নি, হতে পারে না; শুরু থেকে এই অ্যাডভেঞ্চারের নানান স্মারকগুলো হান্টসভিলে গিয়ে দেখলে অনুভব করা যায় কি বিরাট উদ্যোগ মানুষ এতে নিয়েছে, নিচ্ছে; নিজকে বিস্তৃত করার কি দুঃসাহসী আকাঙ্খা মানুষের।



তুতানখামেন

তুতানখামেন এখন হাতের কাছে—এই খবরটি দ্রুত আমাদেরকে আন্দোলিত করলো। কে এই তুতানখামেন? কোথা থেকে তার আগমন? আসলে আগমন তাঁর নিজের নয়, এমনকি তাঁর মৃতদেহের যেটুকু অবিকৃত আদল মমির আকারে কালজয়ী হয়েছে তাও নয়। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের এই বালক নৃপতি শাসন করেছিলেন নীলনদের তীরের শক্তিশালী রাজ্যটিকে। বিশ বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যু হলেও এই দীর্ঘকাল পরে আজকের মানুষ তাঁর সমাধিতে খুঁজে পেয়েছে এক আশ্চর্য প্রত্নতাত্ত্বিক ভাণ্ডার। আরব্য উপন্যাসের আলীবাবার ধনভাণ্ডার থেকেও যা শ্বাসরুদ্ধকর এবং অনেক গুণে বেশি রোমান্টিক। সেই আশ্চর্য ভাণ্ডারের কিঞ্চিৎ এখন লন্ডনে, আমার অস্থায়ী আবাসের কাছে।

নীলনদের তীরের প্রাচীন নগরী থীব্‌সেকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল তুতানখামেন এবং তাঁর আগে পরের অনেক ফারাওদের চমকপ্রদ জীবন। এই মৃতের পুরীতে ঐ সময়কার অনেক স্মৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে—কিন্তু তুতানখামেনের ভাণ্ডারের মতো কিছু আর কখনো পাওয়া যায়নি। ১৯২২ সালের ২৫শে নভেম্বর বলতে গেলে হঠাৎ করেই এটা আবিষ্কার করে জগৎকে চমকে দিয়েছিলেন ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার ও লর্ড কারনারভন। কিন্তু এই এতোদিন কায়রোর যাদুঘরে না গেলে এদের দেখা সম্ভব হতো না। প্রথমবারের মতো মিশরীয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছেন তুতানখামেনের ভাণ্ডার সাময়িকভাবে বিদেশে নিয়ে গিয়ে দেখাতে। অতএব লন্ডনে অবস্থানকালের এই সহজ সুযোগ ছাড়ে কে? তাই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ছুটে আসা।

খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫২ থেকে ১৩৪৩—এই নয় বছরের মতো রাজত্বের সুযোগ পেয়েছিলেন তুতানখামেন। বড় ভাই আখেনাতেন ফেরাও থাকাকালে অকালেই মারা গিয়েছিলেন—তাই নয় বছর বয়সী তুতানখামেনের ফেরাওয়ত্ব লাভ। ঐ অল্প বয়সে বিয়েও করেছিলেন—বড় ভাই ও তাঁর বিখ্যাত সুন্দরী রাণী নেফারতিতির মেয়ে আখেশামুনকে; প্রাচীন মিশরীয় সমাজে এরকম বিয়ে স্বাভাবিক ছিল। যে কারণেই হোক নৃপতি হবার জন্য তাঁকে গড়ে তোলা হয়েছিল একেবারে ছোট্টবেলা থেকে। সেই ছোট্ট তুতানখামেনের লেখাপড়া, খেলাধুলা, আসবাব, অলংকার অনেক কিছুই তাঁর

মমীর সাথে সমাধিস্থ হয়েছিল। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। সমাধিস্থ হয়েছিল এই বালক নৃপতি আর তাঁর বালিকা রাণীর অনেক স্মৃতিচিহ্নত, ব্যবহার্য জিনিস, বহু আনুষ্ঠানিক অথবা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের চিত্রিত বা মূর্তিরূপ। বহু মূল্যবান সোনা ও পাথরে খচিত এসব লোভনীয় জিনিস তিন হাজার বছরেরও উপর সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে সমাধি তস্করদের হাত থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করলো সেটাই আশ্চর্য। অন্যান্য ফেরাওদের সমাধি এদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সামনে দর্শনার্থী জনতার দীর্ঘ সারি সর্পিল ভঙ্গিতে চলে গেছে অনেক দূর। তার প্রান্তে দাঁড়িয়ে তুতানখামেনের ভাণ্ডারে পৌঁছাতে একটা দিনের অধিকাংশই বিসর্জন দিতে হবে! তাই সই; কায়রো পর্যন্ত তো আর যেতে হচ্ছে না। এক সময় পৌঁছেও গেলাম মূর্তিমান তুতানখামেনের কাছে, তাঁর নানান আসবাবের কাছে—যেমনটি সেগুলো সযত্নে সন্নিবেশিত হয়েছিল সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। কিন্তু কেমন করে বলি মাঝখানে সময়ের ব্যবধান সাড়ে তিন হাজার বছরের?

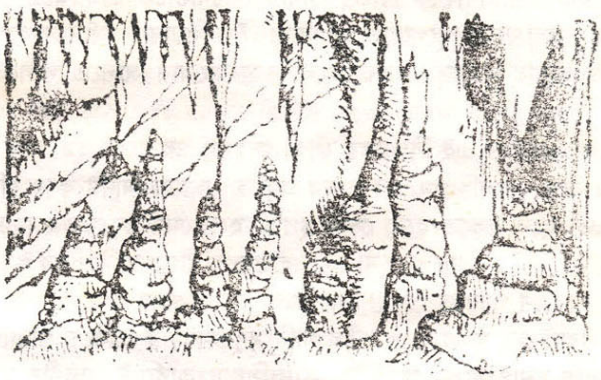
যদি তাই হবে তবে শিশু তুতোনখামেনের দোল খাওয়া ছোট্ট চেয়ারটি এমন সুন্দর, এমন জীবন্ত রইলো কেমন করে? আজকের যে কোন শিশু এতে লাফ দিয়ে বসে দোল খেতে পারলে খুশি হবে। যদি তাই হবে, হবে তুতানখামেনের শেষকৃত্যের জন্য তৈরি মুখোশ এতো উচ্চাঙ্গের কারুকার্য মণ্ডিত হয়ে জাজ্বল্যমান রইলো কেমন করে? বিশেষজ্ঞরা বলেছেন এই মুখোশের চেহারা বালক নৃপতির হুবহু মুখচ্ছবি। আগাগোড়া পেটানো সোনার পাতে তৈরি। এর মধ্যে উজ্জ্বল নীলরঙের কাচ চূর্ণের মিনার কাজ—আর মূল্যবান সব পাথর; টানা টানা দরদভরা চোখের সুন্দর চেহারা, মাথার মুকুটে রাজশক্তির প্রতীক সাপের ফণা। এমন মূল্যবান, এমন বলিষ্ঠ কাজ বহু যুগের ওপার থেকে উঠে এসেছে এ কথা ভাবতে কেমন লাগে?

তুতানখামেনের ছোট বেলার নানা টুকিটাকি, ছোট্ট টুকটুকে বাক্স, খেলনা—প্রত্যেকটি অপূর্ব কাজ করা বিশেষ করে বাক্সের উপরের চিত্রগুলো। সিংহাসন-সদৃশ একটা চেয়ার খুব চোখে পড়ে। কাঠের তৈরি এ চেয়ারের আগাগোড়া সোনার পাতে মোড়ানো। মাঝে মাঝে নানা রঙের মিনার কাজ, চকচকে পাথর—আবার কোথাও বা রূপার পাত। দুটা হাতল তৈরি হয়েছে পাখাওয়ালা দুটা সাপের আদলে আর পায়াগুলো বন্য জন্তুর পায়ের মত—সামনে দু'দিকে সিংহের মুখের প্রতিকৃতি। বসার জায়গাটুকু কিন্তু আরামের জন্য বেতের তৈরি। সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী চিত্রটি কিন্তু চেয়ারের হেলান দেয়ার জায়গায়। বালক রাজা ও বালিকা রাণীর একটি প্রেমময় দৃশ্যের ছবি এটি। তুতানখামেন চেয়ারে ঘরোয়াভাবে বসে আছেন, রাণী আখেশানামুন সামনে দাঁড়িয়ে মমতাভরা ভঙ্গিতে তার গলার কলারটি ঠিক করে দিচ্ছেন ও উপরে সূর্যের রশ্মি ঝরে পড়ছে—সবই সুবর্ণ ধাতুর পাতে আর রঙিন মিনার কাজে চিত্রিত।

ভাণ্ডারে ছোটখাট সূক্ষ্ম অলংকার যেমন রয়েছে—তেমনি রয়েছে বড় সড় আসবাব। বেশ বড় একখানা পালংক রয়েছে—পাশ থেকে দেখলে একটা চিত্রিত গরুর প্রতিকৃতিতে যেটা তৈরি। আসলে গরুর প্রতিকৃতি দেবতা হাথোরের একটা পবিত্র প্রতীক—তাই রাজকীয় শয়ন কক্ষে তার স্থান। অসচ্ছ আলাবেস্টর পাথরে তৈরি বাক্স,

বাতিদানি, আতরদানি, মশলার কৌটো সবকিছুতে উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মের পরিচয় রয়েছে। প্রত্যেকটির পরিকল্পনা, আকৃতি, অলংকরণ আজকের শিল্পমানেও শুধু উত্তীর্ণ নয়, রীতিমত অনবদ্য। মানুষের শিল্পীমন তা হলে দুদশ বছর বা শত বছরের ব্যাপার নয়—এটা মানুষের মতোই প্রাচীন। দুঃখ সুখের অনুভূতিগুলোও, তার প্রকাশের ভঙ্গিগুলোও তেমনি প্রাচীন। এর প্রমাণ তুতানখামেনের ভাণ্ডারের বিভিন্ন কর্মরত ছবি, বিভিন্ন আবেগের ছবি, ধাতুর আর পাথরের খোদাই করা ভাষায়।

সাড়ে তিন হাজার বছর। সময়ে হিসেবে, মানুষের জীবনের হিসেবে তা অনেক দিন। দু'শ বছর আগের কথাকেও মনে হয় কত পুরানো—আর সাড়ে তিন হাজার বছর সেই কবেকার কথা? কিন্তু যদি সেই তখনকার ইতিহাসকে উন্মোচিত করে তুলে ধরে সেদিনের দুটি রাজকীয় বালক-বালিকার ব্যবহার্য জিনিস, অলংকার, নানা টুকি-টাকি—পুরানো নয়, জীর্ণ নয়, মলিন নয়—বরং সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে জ্বলজ্বলে হয়ে, তবে?



পসতায়নার গুহা

ইতালির ত্রিয়েস্ত শহরটা আড্রিয়াটিকের সমুদ্রতীর থেকে শুরু। তারপর সোজা উপরে উঠে গেলে খানিকটা পরেই ইতালি যুগোস্লাভিয়ার সীমান্ত। সে সীমান্ত পেরিয়ে মালভূমির মতো উঁচু সমতল দিয়ে আরো বেশ খানিকটা গেলে যুগোশ্লাভিয়ার পস্তায়না শহর যেখানে রয়েছে দুনিয়ার বৃহত্তম ও আশ্চর্যতম গুহাগুলোর অন্যতম। সেই গুহা দেখতেই সেখানে যাওয়া। পস্তয়না থেকে আরো কিছু দূরে হলো যুগোস্লাভিয়ার একটি বড় শহর, অঙ্গরাজ্য স্লোভেনিয়ার রাজধানী ল্যুব্লিয়ানা।

পস্তয়নার গুহা—সে এক বিরাট ভূগর্ভস্থ পুরী; মাটির ভেতরেই যেন ছোটখাট একটা শহর। তফাত যা তাহলো এ শহরের স্থপতি মানুষ নয়, স্বয়ং প্রকৃতিই গড়ে তুলেছে একে হাজার হাজার বছর ধরে তিলে তিলে। তবে স্থপতি মানুষ না হলে কি হবে ওর মধ্যে যে নিপুণ ভাস্কর্য অদ্ভুত সুন্দর সব আকৃতির যে মোহময় পরিবেশ গড়ে উঠেছে তা দেখলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। রূপকথার পুরীর যে বর্ণনা ছোটবেলায় মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল কোথায় জানি এর সাথে এ গুহার দৃশ্যাবলির একটা মিল রয়েছে। শান্ত, গা ছমছম পরিবেশ, শুধু বাতির মৃদু আলোতে আলোকিত; ওর মধ্যে নানা রঙের পাথরের সব অলৌকিক ভাস্কর্য। সবকিছু ভেজা ভেজা—বয়ে যাচ্ছে ঝির ঝিরে পানি। একটা শব্দ করলে গম গম করে ওঠে পুরো জায়গা। রূপকথার পরিবেশই বটে। ভেতরে রীতিমত একটা শহর। পায়ে হেঁটে চলে শহরের পথতো ফুরাবে না; তাই ভেতরে বেড়াবার জন্য রয়েছে রেলগাড়ির ব্যবস্থা অবশ্য খোলা-ছাদ ছোট্ট সব কামরা ঐ রেলগাড়ির, অনেকটা শিশু পার্কের রেলগাড়ির মতো। গুহার মুখে টিকেট করে ঢুকলে একটু পরেই রেলস্টেশন। সেখান থেকে চলে যাওয়া যায় গহীন গুহার এক্কবারে ভেতরে।

যেতে যেতে দুপাশের সেই অলৌকিক কারুকার্যের বহু নমুনা দেখে যেতে হয়। রেলগাড়ি যেখানে নামিয়ে দেয় সেখান থেকেই আসল অবাক হবার পালা শুরু। বুঝিয়ে দেবার সুবিধের জন্য সবাইকে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীতে ভাগ করে ফেলা হলো। ব্যবস্থা আছে সার্বোক্রোট (যুগোস্লাভদের ভাষা) ইতালিয়ান, জার্মান, ফরাসী, রাশিয়ান আর ইংরেজি ভাষায় গাইডের। শুরু হলো গুহা-রাজ্যের অলিতে গলিতে আমাদের পদচারণা।

মাটির এত ভেতরে এই বিস্ময়কর ফাঁকা জায়গা, ওর মধ্যে এত কারুকার্য—এসব হলো কেমন করে? বলেছিলাম এর ভাস্কর প্রকৃতি। আরো নির্দিষ্ট করে যদি তার নাম করতে হয় তা হলে বলতে হবে সেই স্থপতি হলো মাটির ভেতর দিয়ে চোঁয়ানো প্রবহমান পানি। মাটির মধ্যে যে চুনাপাথরের স্তরকে ধীরে, অতি ধীরে গুলে নিয়ে যায় সেই পানি। সাধারণ পানিতে অবশ্য চুনাপাথর গলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে মিশে বৃষ্টির পানি মৃদু কার্বনিক এসিডে পরিণত হয়। এর সাথে বিক্রিয়ায় চুনাপাথরের অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট, দ্রবণীয় বাইকার্বনেটে পরিণত হয়। এর এবং তাকেই পানি গুলে নিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

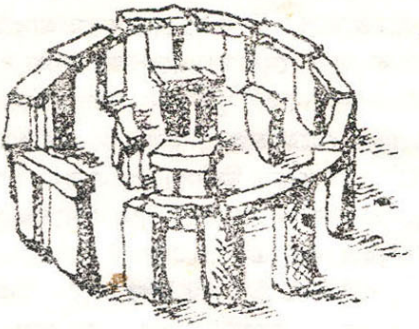
মাটির নিচের ভূগর্ভস্থ পানির পৃষ্ঠতল যেখানে, উপর থেকে পানি নিজের ভারে চুঁইয়ে এসে পড়ে সেখানে; আবার আশপাশ থেকেও পানি চুঁইয়ে এসে ভূগর্ভের অন্তঃসলিলা নদীর ধারার মধ্যে এসে পড়তে পারে। এই পানির সাথে ক্ষয়ে ধুয়ে গেছে চুনাপাথরের স্তর—ক্রমেই সৃষ্টি হয়েছে ছোট থেকে বড় গহ্বর। উপর থেকে শিলাখণ্ড এসে পড়ে এ গহ্বর হয়েছে আরো বড়। এসব কাজ একদিনে হয়নি, হয়েছে খুব ধীরে লক্ষ বছর ধরে। পস্তয়নার গুহার মধ্য দিয়ে চলে গেছে এক অন্তঃসলিলা নদী। দীর্ঘ পথের অনেকখানিই এ নদীর সাথে বাইরের দুনিয়ার সংস্পর্শ ঘটেনি। তবে এই অন্ধকার নদীর ভেতরেও জীবন আছে—আছে বিশেষ ধরনের জলজ প্রাণী। দেখার সুবিধার জন্য ওদের সেখান থেকে তুলে রাখা হয়েছে ছোট ছোট চৌবাচ্চার ভেতরে।

গুহার মধ্যে এত যে সব প্রাকৃতিক ভাস্কর্য তাও কিন্তু পানিরই কীর্তি। এ ভাস্কর্যের সবচেয়ে সুন্দর যে রূপ তা হলো গুহার ছাদ থেকে নেমে আসা অসংখ্য সূঁচালো জিনিস। অনেক দূর নেমে এসেছে এরা, কোন কোনটা তলা পর্যন্ত পৌঁছেছে—আবার অন্যগুলো ঝুলে আছে অদ্ভুত ঝালরের মতো। ঝুলন্ত সূঁচালো জিনিসগুলোর উপর আঙুলের টোকা দিলে যে সুরেলা ধ্বনি উঠে তাতেই বুঝা যায় এদের ভেতরটা ফাঁপা। আকার-আকৃতির উপর নির্ভর করে এদের এক একটা থেকে এক এক রকম তান উঠে সেতারের নানা তারের মতো। ভূতত্ত্বের ভাষায় এদের বলা হয় স্ট্যালেকটাইট এবং স্ট্যালেগমাইট। বেশির ভাগ সাদা বা হলদে হলেও কোন কোনটায় আবার দেখা যায় নানা রঙের ছটা। সব মিলিয়ে গুহার সেই অলৌকিক পরিবেশের জন্য এরাই সবচেয়ে বেশি দায়ী।

গুহার ছাদ চুঁইয়ে চুনাপাথর গোলা পানি যখন অল্প অল্প করে পড়তে থাকে তখন পড়ার আগেই সে পানি গুহার বাতাসে বাষ্পীভূত হতে পারে। পানি চলে গেলে পড়ে থাকে তার মধ্যেকার ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট তলানি। ঐ তলানি থেকেই ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়ে সূঁচালো স্ট্যালেকটাইট আর স্ট্যালেগমাইটগুলো। এদের গা বেয়ে আরো পানি

নেমে আসছে, শুকাচ্ছে—তাতে সূঁচগুলো আরো লম্বা হচ্ছে। এভাবে বড় হয়েছে ওরা। এখনো প্রক্রিয়াটি অব্যাহত আছে, এদের গা বেয়ে নেমে আসছে ফোঁটা ফোঁটা পানি। অনেক সময় চুনাপাথরের সাথে মেশানো থাকে অল্প লোহা বা ম্যাঙ্গানিজ; সেগুলো আবার সুঁচগুলোকে দেয় সুন্দর সব রং। চুনাপাথর-গোলা পানির কিছু কিছু আবার উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা গুহার মেঝেতে পড়ে যায়। সেখানে পানি শুকিয়ে ধীরে ধীরে উপরের দিকে গড়ে উঠে একই ধরনের জিনিস। কখনো কখনো নেমে আসা আর উপরে উঠা দুটি সূঁচালো মুখের দেখা হয় মাঝখানে শূন্যের মধ্যে—সৃষ্টি হয় আরো জটিল আকৃতির। ব্যাপারটা বুঝার জন্য একটা মোটামুটি মডেল খাড়া করা যায়—জ্বলন্ত মোমবাতিকে নিচের দিকে উল্টিয়ে টেবিলের উপর টপটপ মোম ফেলি। গলা মোমের ফোঁটা একের উপর এক পড়ে টেবিলের উপর যেমন গড়ে তোলে মোমের নানা আকৃতি তেমনি মোমবাতি থেকেও ঝুলে পড়ে এরকম আকৃতির ঝালর।

এমনি যে রূপকথার পুরীর মতো অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ তার এক জায়গায় দেখলাম চারদিক গুহার দেওয়াল কালো কালো হয়ে আছে। গাইডের কাছ থেকে জানলাম এটি মোটেই প্রাকৃতিক নয়, একেবারেই মানবিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সুন্দর দেশ যুগোশ্লাভিয়াটি পরিণত হয়েছি নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে এক মরণ পণ সংগ্রামের ক্ষেত্র। সংগ্রাম করছিলো মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে পার্টিসান গেরিলা বাহিনী। এই গুহার মধ্যেও গেরিলাদের চোরাগোপ্তা যুদ্ধ বিস্তৃত হয়েছিল। সেখানে এক অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণের ফলে গুহার এই অংশটি কালো হয়ে গেছে। পৃথিবীর বুকে কোথায়ই বা প্রকৃতির রাজ্য নিস্তার পেয়েছে মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে?



স্টোনহেন্‌জ

দক্ষিণ ইংল্যান্ডের যেখানে আমার সাময়িক বসত ছিল তার কাছের একটা শহর স্যালিসবারী। এখান থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে রয়েছে পুরাতত্ত্ব প্রেমিকদের খুব প্রিয় একটা জায়গা—স্টেনহেন্‌জ। এলাকাটা মোটের উপর ক্ষেত-খামারের জায়গা, রাস্তার দুপাশেই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। এর মধ্যে হঠাৎ একটি জায়গায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃশ্য। স্টোনহেনজের থেকে বেশ দূরে থাকতেই দেখা যায়া বিশাল সব পাথর বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে, একটা প্যাটার্ন নেবার চেষ্টা করে। এই এদের কারণেই স্টোনহেন্‌জ এত বিখ্যাত। এর যারা নির্মাতা তারা এখানে আসর জমিয়েছিল সভ্যতার একেবারে প্রাথমিক অবস্থায়। পুরাতন প্রস্তর যুগ পার হয়ে নব্য প্রস্তরযুগের সভ্যতা তখন এখানে। ধাতু যুগ দেখা দিতেও আর বেশি বাকি নেই। এমনি একটি সময়ে ইংল্যান্ডের এই অংশের বাসিন্দারা কেন জানি ঠিক করলো দৈনন্দিন আটপৌরে কাজের চেয়ে বড় একটা কিছু করবে। তারই ফলশ্রুতি স্টোনহেন্‌জ।

যদিও বিশাল পাথরগুলোই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশি, স্টোনহেন্‌জে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখারও অনেক কিছু আছে। পুরাতত্ত্ববিদরা বলছেন যে আসলে এক যুগের লোকের সৃষ্টি এটা নয়। প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠি এতে অবদান রেখেছে। তিনশ' ফুটের মতো ব্যাসের বিরাট একটা বৃত্তের আকারে অপ্রশস্ত পরিখার একটু ভেতরে সমান আরেকটা বৃত্তে সাজানো অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত। হয়তো বা এক সময় এসব গর্তের ভেতর গেড়ে দেওয়া ছিল পাথরের বা গাছের স্তম্ভ। কেন এসব ওরা বানিয়েছিল সেটা এখনো অনেকাংশে রহস্যাবৃত।

ঐ বড় বৃত্তের ভেতরে শ' খানেক ফুট ব্যাসের একটা বৃত্তের উপর খাড়া আছে জোড়ায় জোড়ায় বিশালকায় সব পাথর। প্রত্যেকটি পাথরের ওজন ৫০ টনের মতো হবে এবং মনে হয় বেশ যত্ন সহকারেই মোটামুটি আয়তাকার করে এদের আকৃতি দেখা হয়েছে। ২৪ ফুঁট উঁচু এরকম খাড়া পাথর প্রায় ত্রিশটার মত। এদের মাথার উপর প্রায় একই মাপের বিশাল আড়াআড়ি পাথর। এখানেই শেষ নয়, ওর ভেতরে আবার

অশ্বখুরাকৃতি শৃঙ্খলায় সাজানো হয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট আরো পাথর। অশ্বখুরের মুখ যেদিকে খোলা তার থেকে নাকি এক সময় প্রশস্ত রাস্তাত চলে গিয়েছিল তিন কিলোমিটার দূরের নদী পর্যন্ত। এখনো দু'পাশের অগভীর পরিখার চিহ্নে রাস্তাটা চিহ্নিত। খোলা মুখের উল্টো দিকে রয়েছে বিশেষভাবে তৈরি বিশালকায় আরেকটি পাথর—যা অল্টার বা বেদী নামে পরিচিত।

প্রস্তর যুগের মানুষ পাথরের ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র ছুরি, ছেনি, কুড়াল বানাতো এই-ই সাধারণ ধারণা। কিন্তু তারা যে ঐ পাথর দিয়েই বিশালকায় স্থাপত্য সৃষ্টিও করতে পারত তার প্রমাণ স্টোনহেন্জ।

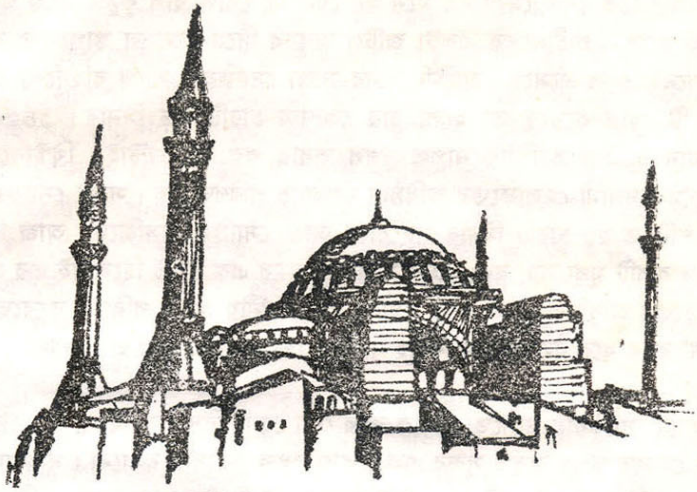
পাথরগুলোর বিশালত্ব এবং তাদের নিখুঁত জ্যামিতিক বিন্যাস বেশ সম্ভ্রম উদ্রেক করার মত। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করার মতো খবর হলো পাথরগুলো স্থানীয় নয়—কারণ আশেপাশের জায়গায় এরকম পাথর পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। বুঝা গেছে যে—বড় পাথরগুলো আনা হয়েছে ২৪মাইল দূরের মার্লবরো ডাউন্স থেকে, যেখানে মাটির উপরেই এরকম পাথর ছাড়ানো ছিল। আর ছোট পাথরগুলো আনা হয়েছে আরো অনেক দূরের দক্ষিণ ওয়েলস্ থেকে। মনে করা হচ্ছে যে ওয়েলসের পাথরগুলো নৌকার সাথে বেঁধে সমুদ্র ও নদী পথে এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু সেই পঞ্চাশ টনী পাথরগুলো এলো কি করে? যে যুগের কথা হচ্ছে তখন পশ্চিম ইউরোপে চাকার ব্যবহার শুরু হয়নি (সভ্যতার এ সব দিকে মিশর বা সুমার থেকে এ জায়গা অনেক পিছনে ছিল)। বড় জোর গাছের গুড়ির রোলারের উপর দিয়ে গড়িয়ে এদের আনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রেও ১৫০০ মানুষের শ্রমে এক একটা পাথর আনতে সাত সপ্তাহ লেগে যাবার কথা। তাছাড়া শুধু এনেইতো খালাস নয় ঐ বিরাট পাথর কেমন করে ২৪ ফুট উঁচুতে তুলে খাড়া পাথরের উপর বসানো হলো? উপায় কিছু একটা নিশ্চয়ই ছিল; ওদের কারিগরি নিয়ে আমরা এখন শুধু আন্দাজই করতে পারি।

আজ খালি মাঠের উপর যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে পড়ে রয়েছে প্রস্তর যুগের মানুষের এই প্রকাণ্ড স্থাপত্য। অথচ এটি তৈরিতে সেদিনকার মানুষের কি শ্রমই না দিতে হয়েছে! আজ শুধু পর্যটকরা ঘুরে ফিরে দেখছেন, ছেলেমেয়েরা পাথরের আড়ালে আবডালে লুকোচুরি খেলছে, সৌখিন চিত্রকর আর পুরাতত্ত্ববিদরা আঁকজোক, মাপামাপি করছেন, নোট নিচ্ছেন। কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই স্থানীয় জনগোষ্ঠি কাছে এটি একটি বিরাট ভূমিকা পালন করতো। আজ থেকে হাজার চারেক বছর আগে মানুষের কাছে এর গুরুত্বটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের ছিল। কিন্ত কি সেই গুরুত্ব?

এই প্রশ্নটি নিয়ে গবেষণা চলছে পুরাতত্ত্ববিদ ও অন্যান্যদের মধ্যে আজ বহু দিন ধরে। এখনো নতুন নতুন তত্ত্ব এ সম্বন্ধে তাঁরা দিয়ে চলেছেন। তবে যে জিনিসটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো তা হলো সূর্যোদয়ের দিকের সাথে পাথরের বিন্যাসের একটা সম্বন্ধ। বছরের সবচেয়ে লম্বা দিন ২৩শে জুন—গ্রীষ্মের ঠিক মধ্য দিন, মিড্সামার ডে। চক্রাকার মূল পাথরগুলোর থেকে দূরে হিলস্টোন নামক বিশেষ একটি পাথর রয়েছে যেটার বরাবর পেছন থেকে ঐ দিন সূর্যোদয় হয়—আজও হয়, চার হাজার বছর আগের সেই দিনগুলোতেও হতো। তবে কি ঋতু পরিবর্তন, বছরের নানান সময়ের সুপ্রাচীন

এক মানমন্দির, যার মাধ্যমে একটি আদি বার্ষিক ক্যালেন্ডারের মতো জিনিস গড়ে তোলা সম্ভব হতো। আজকাল বিজ্ঞানীরা এমনটিই মনে করছেন।

শুধু তাই নয়, এখন বিজ্ঞানীরা ভাবছেন যে ঐ প্রস্তর বিন্যাসের মধ্য দিয়ে আরো নানা পর্যবেক্ষণ সম্ভব হতো যেগুলো অন্যান্য জ্যোতির্বিদ্যার ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়লে মনে করেন গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার হিসেবও পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে সেদিনের মানুষ করতে পারতো। তা যদি হয় তবে প্রস্তর যুগের মানুষের সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা আমাদের বদলাবার প্রয়োজন রয়েছে। গণিতে ও মাপজোকে তাদের দক্ষতা যথেষ্ট ছিল বলে মনে করতে হবে। মহাকাশের পর্যবেক্ষণের সাথে মহা শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি অনুভব—এই-ই হয়তো ছিল প্রস্তর যুগের সৃষ্টিশীল মানুষের ষ্টোনহেনজ সৃষ্টির মূল প্রেরণা।



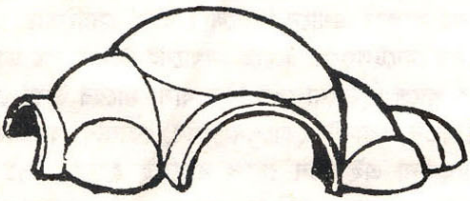
আয়া সোফিয়া

ইস্তাম্বুলের ঠিক এ জায়গাটিকে মনে হয় সারা দুনিয়ার তরুণ পর্যটকদের একটা মিলন ক্ষেত্র। অধিক সংখ্যায় মার্কিনীরাতো বটেই, ইউরোপের নানা দেশের মায় ভারতের, নেপালের নানা জনের সাক্ষাৎ এখানে মিললো। আয়া সোফিয়ার আশেপাশেই নানা গলিগুঁজির মধ্যে যে সব হোটেলগুলো রয়েছে সেখানেই আমার মত তাদেরো মুসাফিরি। আর ওসব গলির এক পাশে দাঁড়ানো বেশ কিছু বাস, গায়ের উপর লেখা দেখেই বুঝা গেল কোনটা যাচ্ছে লন্ডন, কোনটা কোপেনহাগেন, কোনটা বেলগ্রেড আবার কোনটা তেহরান, দিল্লী; ভাবখানা এই যেন চেপে বসলেই হলো। স্পষ্টত ইস্তাম্বুল আজ ইউরোপ-এশিয়া জোড়া পর্যটনের একটি বড় জংশন। আর এখানে সবার বড় আকর্ষণ আয়া সোফিয়া ও বসফরাস।

এই আকর্ষণ আজকের নয়। যেদিন নগরটা ইস্তাম্বুল ছিল না, ছিল কনস্টান্টিনোপল; আর যেদিন আয়া সোফিয়া ছিল সান্তা সোফিয়া গির্জা তখনো এটি ছিল জগতের বিস্ময়। খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন রোম থেকে পূর্ব দিকে সরে এসে ইউরোপের একপ্রান্তে এখানে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। রোমের গৌরব অস্তমিত হলে এই কনস্টান্টিনোপলই হয়েছিল শক্তিশালী বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বিন্দু। যে বাইজেন্টাইন শিল্পকলার বিকাশ এখানে, তারই আদি ও সুন্দরতম উদাহরণ হলো সান্তা সোফিয়া। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫৩০ খ্রিস্টাব্দে এটা তৈরি করিয়েছিলেন আর এই অপূর্ব স্থাপত্যের নাম দিয়েছিলেন সান্তা সোফিয়া অর্থাৎ 'পবিত্র জ্ঞান'। বিশালতায়, স্থাপত্যের অভিনবত্বে এবং শৈল্পিক প্রকাশে এটি সেদিনের সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আজও এটি তেমনিই আছে ইস্তাম্বুলের ব্যস্ত জনপদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এর আশপাশটা ঠিক খোলামেলা নয় মনে হয় যেন বহু খোপ-খাপ কুঠুরি একে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে—প্রাচীনত্বের একটা জটিল অবয়ব দিয়ে। আসল স্থাপত্যের কারিগরি প্রয়োজনেই এসব এসেছে। জাস্টিনিয়ানের সান্তা সোফিয়ার সাথে বহির্দৃশ্যে যে নতুন জিনিসটি যোগ হয়েছে তা হলো চার কোণায় চারটি বড় মিনার। ১৪৫৩ সালে অটোমান তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপল দখল করার পর বাইজেন্টাইন খ্রিস্টানদের এই কেন্দ্রভূমি ইসলামী খেলাফতের অধিষ্ঠান নগরীতে পরিণত হয়। সান্তা সোফিয়া গীর্জা তখন পরিণত হয় চারটি মিনার সহযোগে আয়া সোফিয়া মসজিদে। আজ কিন্তু এর মসজিদ রূপটি মুখ্য নয়, বরং মানব সভ্যতার অমর এক কীর্তি হিসেবেই এর প্রাধান্য। আতাতুর্কের আধুনিক তুরস্ক একে ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনীয় স্থানে পরিণত করেছে। সাড়ে চৌদ্দশ' বছর ধরে বসফরাসের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ইতিহাসের এক অক্ষয় সাক্ষী এই স্থাপত্য।

আয়া সোফিয়ার স্থাপত্যে অবাক করে দেয় যে জিনিসটি তা হলো বর্গাকার একটা বিরাট মেঝের উপর অদ্ভুত সুন্দর এক প্রকাণ্ড গম্বুজ সরাসরি বসানো। মাঝখান কোন থাম খাম্বা কিছু ছাড়াই এটি ২৪০ ফুট উঁচু একটি বিশাল ঘনায়তনের সৃষ্টি করেছে। সমস্যা ছিল বর্গাকার ঘরের উপর এই বৃত্তাকার গম্বুজটা ফিট করবে কি করে, কি করেই বা ১০৭ ফুট ব্যাসের প্রকাণ্ড গম্বুজটি মাঝখানে কোন অবলম্বন ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকবে? এর সমাধান হয়েছিল খিলানের ব্যবহারের মাধ্যমে।



খিলানের উপর প্রধান গম্বুজ ও আধা-গম্বুজগুলো

লোহা ও ইস্পাতের সাহায্যে আজকাল টানের পীড়ন সহ্য করতে পারে মত বীমের ব্যবহার করা হয় বড় দালান কোঠায়। কিন্তু সেকালের এই ইট-পাথরের ইমারতকে একমাত্র যে পীড়নটি সহ্য করানো যেত তা হলো চাপের পীড়ন। বক্রাকার খিলানের মধ্যে একই সাথে দুই দিকের চাপকে ব্যবহার করে বেশ দীর্ঘ শূন্যস্থানকে আবৃত করা সম্ভব। আয়া সোফিয়ার গম্বুজকে বসানো হয়েছে এমনি চারটি বৃহৎ খিলানের ওপর। যদিও ভার কমাবার জন্য প্রকাণ্ড গম্বুজটি ঝামা ইটে তৈরি করা হয়েছে, তবুও এর চাপটি প্রচণ্ড এবং খিলানের মাধ্যমে সেটি গিয়ে পড়ছে ঘরের চার কোণায়। চাপ বহনের এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্য খিলানগুলোকে আবার ঠেকা দেওয়া হয়েছে কিছু আধা গম্বুজ ও আরো খিলান দিয়ে। প্রধান গম্বুজে যেখানে চাপ সৃষ্টি করছে বাইরের দিকে আধা-গম্বুজগুলো চাপ সৃষ্টি করছে ভেতরের দিকে—এভাবে চাপের ভারসাম্য রক্ষিত

হয়। এ সবের ফলেই মূল ভবনের চতুর্দিক মনে হয় এক ধরনের ইট-পাথরের স্তূপাকৃতির নিচে বিশাল একটি খোলা স্পেস—এটাই আয়া সোফিয়ার সৌন্দর্য।

ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালে কিন্তু বাইরের ইট-পাথরের জটিলতাকে একেবারে ভুলে যেতে হয়। এত খোলামেলা সেখানকার পরিবেশ। এমনকি বড় গম্বুজটার কিনারায় এতোগুলো জানালা কাটা রায়েছে যে হঠাৎ মনে হয় গম্বুজটার তলায় যেন কোন অবলম্বনই নেই, এটা শূন্যে ভাসছে ভেতরের সাজসজ্জার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতেই বুঝা যায় যে সাড়ে চৌদ্দশ' বছর আগে কী মূল্যবান উপাসনালয় হিসেবে একে গড়ে তোলা হয়েছিল। পাথরকুচির রঙিন মোজাইকের বাইজেন্টাইন ধরনের চিত্রণে বাইবেলের যে দৃশ্যাবলি উৎকীর্ণ হয়েছিল তার খানিকটা এখানে ওখানে দেওয়ালের উপর এখনো আছে। তাছাড়া চারদিকে সুন্দর ব্যালকনি, কোথাও সোনার পাত, মার্বেলের থাম, রঙিন কাচের ভেতর দিয়ে আলোর ছটা সব মিলিয়ে এর প্রাচীন গরিমা এখনো উপলব্ধি করা যায়।

আয়া সোফিয়ার বাইরের অবয়ব দূরে থেকে দেখা, তারপর ভেতরে ঢুকে গম্বুজের নিচে খানিকক্ষণ কাটিয়ে আসা—এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এর ইতিহাস, এর স্থাপত্য, এর বিশালত্ব গভীরভাবে অনুভব না করে উপায় নেই। এখান থেকে বের হয়ে হেঁটে গেলাম অদূরে বসফরাস প্রণালীর পাড়ে। ইউরোপ আর এশিয়ার মাঝখানে সরু এক ফালি জলরাশি। অথচ এইটুকুকে লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে রাজনীতির কত কুটিল ইতিহাস, কত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ! কৃষ্ণ সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে বেরুবার এই-ই একমাত্র জলপথ বলে জার শাসিত রাশিয়ার প্রলুব্ধ দৃষ্টি বরাবর ছিল এর উপর। সেখান থেকেই যত সংঘাত। বসফরাসের পাড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবেই উঠে পড়লাম একটা যাত্রীবাহী লঞ্চে। তুর্কি যাত্রীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে দেখলাম বসফরাসের দুই পাড়—ওপারে ইউরোপ, এপারে এশিয়া। লঞ্চটি বিভিন্ন ঘাটে থামার জন্য এপার ওপার করতে করতে বসফরাসের শেষপ্রান্তে কৃষ্ণ সাগরের কাছাকাছি যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত।



লাইডেন, পরম শূন্যের পথে

আমস্টার্ডাম থেকে লাইডেন ট্রেনে অল্প খানিকক্ষণের পথ। পথে পথে বিশাল প্রান্তরজোড়া ড্যাফোডিল, টিউলিপ প্রভৃতি ফুলের চাষ, মাঝে মাঝে পুরানো অব্যবহৃত কিছু বায়ুকল, বইয়ে পড়া হল্যান্ডের সব হুবহু দৃশ্য। লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর—ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি; সুইডেনের উপসালা, ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বা পোল্যান্ডের ক্রাকাউ—এর সাথে এক সারিতে যার নাম আসে। আমার কাছে লাইডেনের গুরুত্ব অবশ্য তার সুদূর প্রাচীনত্বে নয়, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক প্রাচীনত্বে। গত কয়েক শতক ধরে লাইডেনের পদার্থবিদ্যা তার অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়েছে। শহরটি পদার্থবিদ্যার একটি ঐতিহাসিক নাম যুগিয়েছে অষ্টাদশ শতকেই। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যখন ঝড়ের আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিজলী সংগ্রহ করছিলেন তখন তাঁর সাথে ছিল সদ্য আবিষ্কৃত একটি লাইডেন জার (লাইডেন বোতল), আজকের ক্যাপাসিটারের প্রথম সংস্করণ। ওর মধ্যেই তিনি বিজলীকে সংরক্ষিত করেছিলেন পরবর্তী পরীক্ষার জন্য। মজার ব্যাপার হলো এর বহু কাল পরে বিখ্যাত পদার্থবিদ এহরেনফেস্টের নেতৃত্বে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পদার্থবিদ্যার ঘরোয়া আলোচনা আর বিতর্কের জন্য একটি চমৎকার গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল—সেটাকেও বলা হত 'লাইডেন জার'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে কেউ বাইরে থেকে এলে আমরা সগর্বে দেখাই—সত্যেন বসু এখানে বসতেন, এখানে কাজ করতেন ইত্যাদি। লাইডেনে ওদের এরকম দেখাবার অনেক কিছু এবং ওরা সগর্বেই এগুলো দেখায়। অনেক কিছুই সেখানে পীটার জীমানের স্মৃতিবিজড়িত (নোবেল পুরস্কার ১৯০২)। জীমানকে ১৮৮৩ সালে মুরুব্বিরা পরামর্শ দিয়েছিলেন পদার্থবিদ্যা না পড়তে কারণ ওটার যা জানার সব জানা হয়ে গেছে। কিন্তু এই জীমান লাইডেনের পরমাণুবিদ্যায় নতুন দিগন্ত এনেছিলেন। লাইডেন আনতুন লোরেঞ্জের বিশ্ববিদ্যালয়—অনেকে যাঁকে ডাচ পদার্থবিদদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন (নোবেল পুরস্কার ১৯০২)। এ নামটি পদার্থবিদ্যার ছাত্রকে বারবার নানা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। এহরেনফেস্ট, দে হাস, উহলেনবেক, গোডস্মীট, ক্রেমার—আরো কত নাম কত স্মৃতি এর পুরানো, গলিগুঁজি ভরা ল্যাবেরেটরি আর ক্লাসরুমগুলোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে! কিন্তু আমার প্রধান আকর্ষণ নিম্ন উত্তাপ গবেষণায় লাইডেনের ঐতিহাসিক প্রাধান্য—যার আদি নায়ক কেমারলিং ওনেস।

বস্তুর উত্তাপ হচ্ছে তার পরমাণুগুলোর গতিশক্তির একটি পরিমাপ। উত্তাপ যত কমানো যায় এ গতি ততই কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি নিম্ন উত্তাপে পৌঁছোনো যেতে পারে যেখানে এই গাতি প্রায় শূন্যের কোঠায়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দ্বারা নির্ধারিত ক্ষুদ্র একটি শূন্য-শক্তি ছাড়া আর কিছুই শক্তি তার অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই এর চেয়ে কম কোন উত্তাপ আর সম্ভব নয়। এটাই পরম শূন্য উত্তাপ। নীতিগতভাবে এই উত্তাপের অবস্থিতি, তার পরিমাপ ইত্যাদি সবই জানা হয়েছিল (এটা গলন্ত বরফের উষ্ণতা, অর্থাৎ ০° সেলসিয়াসের চেয়ে ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে)। এর জন্য একটি নতুন উত্তাপ স্কেল তৈরি হয়েছিল যাতে পরম শূন্য উত্তাপ ০° কেলভিন (K) এবং গলন্ত বরফের উষ্ণতা ২৭৩°কেলভিন। কিন্তু পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব এও বলে দিয়েছিলো যে পরম শূন্য উত্তাপের কাছে, অতি কাছে চলে যাওয়া সম্ভব হলেও ঠিক পরম শূন্য উত্তাপ সৃষ্টি করা নীতিগতভাবে অসম্ভব।

পরম শূন্যের দিকে সেই যাত্রায় লাইডেন প্রথমে পুরোভাগে ছিলনা। শীতলতা সৃষ্টি করা হতো নিম্ন স্ফুটনাংকের এক একটি গ্যাসকে তরলে পরিণত করে। নিম্ন উত্তাপ ও চাপ প্রয়োগ করে ক্রমেই নিম্ন থেকে নিম্নতর স্ফুটনাংকের গ্যাসকে তরলিত করা হলো, পাওয়া গেল আরো নিম্ন উত্তাপ। ১৮৭৭ সালে বাতাসকে প্রথম তরলিত করা হয়। এভাবে পৌঁছানো যায় ৮০° কেলভিন উত্তাপে (অর্থাৎ বরফের চেয়ে ১৯৩° ডিগ্রি উত্তাপে)। ১৮৯৮ সালে ইংল্যান্ডে রয়্যাল ইনস্টিটিউটে ডিউয়ার তরলিত করতে সক্ষম হলেন হাইড্রোজেন—উত্তাপ নেমে এল ২০° কেলভিনে। এর পরের বড় পদক্ষেপটি কিন্তু এল লাইডেন থেকে—আর তখন থেকেই লাইডেনের নেতৃত্ব। লাইডেনের এই নেতৃত্ব সৃষ্টির কৃতিত্ব প্রায় এককভাবে একজন বিজ্ঞানীর কেমারলিং ওনেস। লাইডেনের নিম্ন উত্তাপ গবেষণাগার তিনি যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন সেটি রীতিমত একটি ইতিহাস।

ওনেস তাঁর যন্ত্র তৈরির জন্য নিয়ে এলেন অত্যন্ত দক্ষ একজন কাচের কারিগর কেসেরলিংকে জার্মানি থেকে, যিনি পরে হল্যান্ডে এই কাজের একটি ট্র্যাডিশন সৃষ্টি

করেছিলেন। তাছাড়া ফ্লিম নামে এক জন অত্যন্ত দক্ষ কারিগরের নেতৃত্বে তিনি একদল কুশলী সৃষ্টি করেছিলেন। কেসেরলিং এবং ফ্লিমের নাম এখন এখানে কিংবদন্তীতে পরিণত। সবচেয়ে বড় কথা তিনি গড়ে তুলতে পারলেন সহকর্মী ও ছাত্রদের একটি সঠিক দলকে। এভাবে লাইডেনে একে একে বাতাস আর হাইড্রোজেনকে তরলিত করার ব্যাবস্থা হলো। তারপর ১৯০৮ সনে কেমারলিং ওনেস এখানে হিলিয়াম তরলিত করে উত্তাপকে একেবারে ৪° কেলভিনে নামিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। তাঁর এ কৃতিত্ব এতই বিশিষ্ট ছিল যে ১৯২৩ সন পর্যন্ত একমাত্র লাইডেনেই তরল হিলিয়াম তৈরি সম্ভব হতো। ওনেস শুধু নিম্ন উত্তাপ সৃষ্টিই করলেন না, এর দু এক বছর পরেই তিনি দেখালেন পদার্থবিদ্যায় কি চমকপ্রদ আবিষ্কারের পথ এটা করে দিতে পারে। আবিষ্কৃত হলো অতি পরিবাহকত্বের গুণ—নিম্ন উত্তাপে যেখানে কোন কোন পদার্থ বিদ্যুৎ প্রবাহকে বাধা দেবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। নিম্ন উত্তাপে পদার্থের বৈশিষ্ট্যময় আচরণের জন্য পদার্থবিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখার সৃষ্টি এভাবে হলো লাইডেনের ল্যাবোরেটরিতে।

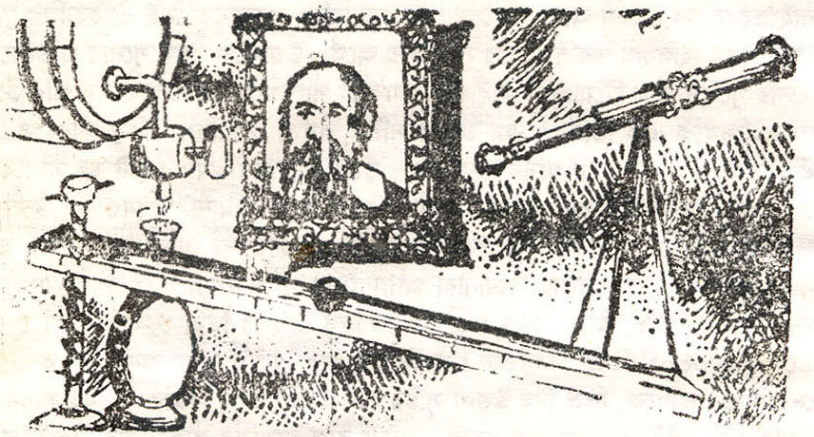
ইতিমধ্যে বায়ুশূন্য করার পাম্পের সাহায্যে তরল হিলিয়ামের উপর বাষ্পচাপ কমিয়ে আরো নিম্ন উত্তাপে তাকে নামিয়ে আনা সম্ভব হলো। এভাবে কেমারলিং ওনেস নিজেই সৃষ্টি করলেন ১°কেলভিনের নিচের উত্তাপ। ১৯২২ সালে তিনি ০.৮৩° কেলভিন উত্তাপে নিয়ে এলেন তরল হিলিয়ামকে। আরো ভাল পাম্প ব্যবহার করে কীসম ০.৭১° কেলভিন উত্তাপ সৃষ্টি করলেন। ০.৮৩ থেকে ০.৭১ এ আসতেই লেগে গেল দশটি বছর। কিন্তু লাইডেনের পদার্থবিদরা ওনেসের ট্র্যাডিশন বজায় রাখলেন। চললো পরম শূন্যের পথে তার অব্যাহত অগ্রযাত্রা। ওনেস সব সময় বলতেন পদার্থবিদ্যার সব গবেষণাগারে একটা কথা লিখে রাখতে হবে 'ড্যুর মেটেন টট ভেটেন' অর্থাৎ পরিমাপের মধ্য দিয়েই জ্ঞান। এই নীতির বাস্তবায়ন লাইডেনের অগ্রযাত্রায় খুবই সহায়ক হয়েছিল।

হিলিয়ামের চেয়ে নিম্নতর স্ফুটনাংক রয়েছে এমন কোন গ্যাস নেই। কাজেই গ্যাস তরলিত করার মাধ্যমে এর চেয়ে নিচের উত্তাপে নেমে আসা আর সম্ভব ছিল না। কিন্তু উপায় আবিষ্কৃত হলো এই লাইডেনেই ১৯৩৩ সালে। এখানে হাস এবং ক্রেমার চৌম্বক হিমায়ন নামে এক পদ্ধতিতে প্রথমে ০.২৭ ডিগ্রি কেলভিন উত্তাপ সৃষ্টিতে সমর্থ হলেন। একই পদ্ধতিতে করে আরো অনেক নিচের উত্তাপ এখানে সৃষ্টি সম্ভব হলো ০.০০১ ডিগ্রি কেলভিনের কোঠায় অর্থাৎ পরম শূন্য থেকে মাত্র হাজার ভাগের এক ডিগ্রি উপরে। তা হলে পরম শূন্যের আর বাকি রইলো কোথায়? না, ঐ বাকিটুকুও বিজ্ঞানীদের জন্য অনেক পথ। চৌম্বক হিমায়নে তরল হিলিয়ামের সংস্পর্শে রেখে বিশেষ ধরনের লবণকে চুম্বক হিমায়নে তরল হিলিয়ামের সংস্পর্শে রেখে বিশেষ ধরনের লবণকে চুম্বকায়িত করা হয় ফলে এর অণুর বিশৃঙ্খলা কমে যায়। এর পর তাকে পরিবেশের সাথে তাপ-বিচ্ছিন্ন করে রূদ্ধ তাপে বিচুম্বকিত করলে তার উত্তাপ হ্রাস পায়।

নিম্ন উত্তাপ কিন্তু এক ডিগ্রির হাজার ভাগের একভাগে থেমে নেই, লাইডেনেও না, অন্যত্র আরো নানা ল্যাবোরেটরিতেও না। লাইডেনের পদার্থবিদগণ এই বিষয়ে তাঁদের

ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য গর্বিত এবং তৎপর। নিম্ন উত্তাপ পদার্থবিদ্যা এখনো লাইডেনের গর্ব। তাঁরা আমাদের দেখালেন কেমারলিং ওনেসের সেই ঐতিহাসিক যন্ত্র যাতে প্রথম হিলিয়াম তরলিত করে সত্যিকার অর্থে—উত্তাপকে পরম শূন্যের প্রতিবেশে আনার সুযোগ করে দিয়েছিল। সেই বায়ু শূন্যকারী পাম্পগুলো যেগুলো ওসেম আর তাঁর সহকর্মীদেরকে এক ডিগ্রিরও কম উত্তাপ সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়েছিল। কিন্তু সাথে সাথে তাঁরা তাঁদের আধুনিকতম গবেষণাগুলোকেও তুলে ধরলেন। এমন একটি যন্ত্র সমাবেশ দেখালেন যেখানে বাইরের যানবাহন ইত্যাদি থেকে আসা সামান্য কম্পনও নিম্ন উত্তাপে বিঘ্ন ঘটাবে উত্তাপে এতই নিম্ন উত্তাপের বস্তুটি পৌঁছতে না পারে তার জন্যও বহু সাবধানী ব্যবস্থা! লাইডেনের বিজ্ঞানীরা অন্যান্যদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলে আসছেন পরম শূন্যের কাছে, আরো কাছে। এভাবে যা ছিল ০.০০১ ডিগ্রি কেলভিন, তা নেমে এসেছে ০.০০০১ ডিগ্রি কেলভিনে। দশমিকের পর একটি শূন্য অনায়াসে বাড়িয়ে দেওয়া যায় কাগজে, কিন্তু নিম্ন উত্তাপ সৃষ্টির রেকর্ডে তা যোগ করতে বহু বহু সাধনার এমনি এক একটি শূন্য বাড়িয়ে চলার সাধনায় ব্যস্ত রয়েছেন লাইডেনের বিজ্ঞানীরা। আদি গুরু কেমারলিং ওনেসের মূলমন্ত্রে তাঁরা এখনো বিশ্বাসী—"ড্যুর মেটেন টট ভেটেন"।

লাইডেন ছোট শহর—প্রাচীনত্বের ছাপ তার সারা গায়ে; শান বাঁধানো রাস্তা, পুরানো ঘর বাড়ি সবকিছুতে। লাইডেনের সাধনার নিরবিচ্ছিন্নতা তার চেহারার মতই সনাতন। প্রাচীনগন্ধী কেমারলিং ওনেস ল্যাবোরেটরি থেকে বের হয়ে শান বাঁধানো পথে হাঁটতে হাঁটতে এই কথাটিই বার বার মনে হয়। মানুষ বেঁচে থাকে অতি সংক্ষিপ্ত একটি সময়। কিন্তু সেময়ে সে যদি গড়ে তুলতে পারে ঐতিহ্য, দেখাতে পারে পথ তা হলে তার কীর্তি শুধু বেঁচে থাকে না সামগ্রিক অগ্রযাত্রায় তার অবদান চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। পরম শূন্য উত্তাপে মানুষ কোন দিন পৌঁছাবে না। কিন্তু তার আরো কাছে যাওয়াটা যে বড়ই জরুরী। পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়, পথের দু'পাশে রয়েছে মোর দেবালয়—এ কথা বোধ হয় এখানেই সার্থক।



গ্যালিলিও স্মৃতি : ফ্লোরেন্স

ঘণ্টা বাজাতে খুলে দিলো এক কিশোরী। একটু পরেই দেখা হলো ওর মায়ের সাথে। ওরা মা-মেয়েই দর্শকদেরকে বিজ্ঞান ইতিহাস মিউজিয়ামটি দেখাবার জন্য ভারপ্রাপ্ত। ইউরোপীয় রেনেসাঁর সাথে অবিচ্ছেদ্য এই শহর ফ্লোরেন্সে পর্যটকের ভিড় যথেষ্ট। মাইকেল এঞ্জেলোর খোদাই করা ডেভিড, বটিচেল্লীর ভেনাস—এরা তো এখানেই। কিন্তু তার মধ্যে ফ্লোরেন্সের এই নির্জন গলিতে ততোধিক নির্জন এই বাড়ি আমার জন্য রেখেছে আরো বড় আকর্ষণ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর আগের দিনগুলোতে এই ফ্লোরেন্স ও তার আশপাশেই আধুনিক পরীক্ষণ পদার্থবিদ্যার আর দূরবীন-নির্ভর জ্যোতির্বিদ্যার ভিত রচিত হয়েছিল যার মূল নায়ক ছিলেন গ্যালিলিও। ফ্লোরেন্সের এই নির্জন বাড়ি, ধারণ করছে তার কিছু নিদর্শন।

পীসা আর পাদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় গ্যালিলিওর প্রথম জীবনের কর্মক্ষেত্র হলেও তাঁর আনুগত্য সব সময় ছিল এই ফ্লোরেন্সের প্রতিই। নিজের তৈরি দূরবীন আকাশের দিকে তাক করে এ সময় গ্যালিলিও একের পর এক বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছিলেন—অজানা সব তারা, ছায়াপথের প্রকৃতি, চাঁদের খাদ-পাহাড়, সূর্যের কলংক ইত্যাদির সন্ধান দিয়ে। বৃহস্পতির চারটা চাঁদ এই গ্রহকে আবর্তন করছে—এটা আবিষ্কার করে গ্যালিলিও এদের নাম দিয়েছিলেন 'মেডিচিয়ান তারা।' বলা বাহুল্য মেডিচিরা ছিলেন ফ্লোরেন্সের অধিকর্তা গ্যালিলিওর বরাবরের উৎসাহদাতা।

১৬১০ সালে গ্যালিলিও পাদুয়ার অধ্যাপনার চাকরিটা ছেড়েই দেন। তিনি ফিরে এলেন তাঁর প্রিয় ফ্লোরেন্সে, শিক্ষকতা বাদ দিয়ে শুধু গবেষণায় মন দিতে। এখানেই তিনি দূরবীনের সাহায্যে দেখালেন শুক্র গ্রহেরও চাঁদের মতো কলা আছে। এসব দূরবীনের প্রায় শ'খানেক বানিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতেই। ইউরোপের রাজন্যবর্গকে

উপহার দিয়েছেন বেশ কয়টা। তাঁর তৈরি এবং ব্যবহৃত এমনি দুটি দূরবীন রাখা আছে ফ্লোরেন্সের এই বিজ্ঞান-ইতিহাস যাদুঘরে।

এর একটির বিবর্ধন ক্ষমতা ১৪ গুণ। এক ডিগ্রি কোণকে ষাট ভাগ করলে পাই এক আর্ক সেকেন্ডে। এই দূরবীনের রিজলভিং পাওয়ার ২০ আর্ক সেকেন্ড—অর্থাৎ ঐ টুকু কৌণিক দূরত্বের সমান মাপের মধ্যে দৃশ্য বস্তু আলাদা করার ক্ষমতা এর আছে। তাছাড়া চোখ লাগালে ১৭ আর্ক মিনিট পর্যন্ত কোণ এতে এক সাথে দেখা যায়। দ্বিতীয় দূরবীনটির বিবর্ধন ২০ গুণ, রিজলভিং পাওয়ার ১০ আর্ক সেকেন্ডে আর দৃশ্য ক্ষেত্র ১৭ আর্কমিনিট। দূরবীনের সাথে সূক্ষ্ম কোণ পরিমাপের ব্যবস্থা করে গ্যালিলিও একে জ্যোতির্বিদ্যার মাপজোকে ব্যবহার করেছিলেন। ১৬১২ সালের ৩১শে জানুয়ারি তিনি বৃহস্পতি গ্রহের ব্যাস মাপেন ৪১ আর্ক সেকেন্ডের হিসেবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন যে সঠিক দূরত্ব ও ব্যবধান মাপার জন্য একটা যন্ত্র তিনি সদ্য বানিয়েছেন।

মিউজিয়ামে রাখা এই দূরবীনই মনে হয় গ্যালিলিওর দূরবীনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রিজলভিং পাওয়ার সম্পন্ন। এর ২০ আর্ক সেকেন্ড রিজলভিং পাওয়ার অবশ্য বৃহস্পতির আলোর জন্য খানিকটা কমে যায়। কাজেই গ্যালিলিও যদি বৃহস্পতির পর্যবেক্ষণে এই দূরবীন ব্যবহার করে থাকেন তা হলে এর চাঁদগুলো গ্রহের কিনারা থেকে অন্তত ২৫ আর্ক সেকেন্ড বাইরে না আসা অবধি তিনি তাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

দূরবীনগুলোই ফ্লোরেন্সের মিউজিয়ামে গ্যালিলিওর একমাত্র স্মৃতি নয়। যেই পরীক্ষণগুলোর মাধ্যমে গ্যালিলিও আধুনিক বলবিদ্যার ভিত রচনা করেছিলেন সেই যন্ত্রপাতিরও কিছু হুবহু নমুনা এখানে রাখা আছে। পড়ন্ত বস্তুর গতি সম্বন্ধে গ্যালিলিওর কাজ বলবিদ্যার একটি যুগান্তরকারী পরীক্ষা। সরাসরি উপর থেকে ফেলানো বস্তু অতি দ্রুত পড়ে যায়,তার গতি লক্ষ্য করা মুশকিল। তাই গ্যালিলিও ঢালু তলের উপর দিয়ে বল গড়িয়ে এই পড়ার গতি কমিয়ে দিলেন। গ্যালিলিওর কালে এই সময়টুকু মাপাও সহজ ছিল না। এই ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন জলঘড়ির মাধ্যমে—বড় পিপা থেকে একটা পাত্রে পানি ফেলে। গ্যালিলিওর ঢালু তলটার ঢাল ইচ্ছে মত কমিয়ে বাড়িয়ে পরীক্ষাটি করা যেত। শুধু পড়ন্ত বস্তু নয়—এর দ্বারা সমভাবে ত্বরিত যে কোন বস্তুর গতির নিয়ম গ্যালিলিও আবিষ্কার করতে পারলেন। এসব পরীক্ষার সরঞ্জামাদি ঠিক তেমনটিই দেখতে পেলাম যেমনটি ছিল গ্যালিলিওর কাছে।

আজ স্কুলের ছেলেরাও জানে একটা বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে কত দূর যাবে তা বের করা যায় এই সূত্র থেকে—

$$\text{দূরত্ব} = \frac{১}{২} \times \text{ত্বরণ} \times (\text{সময়})^২$$

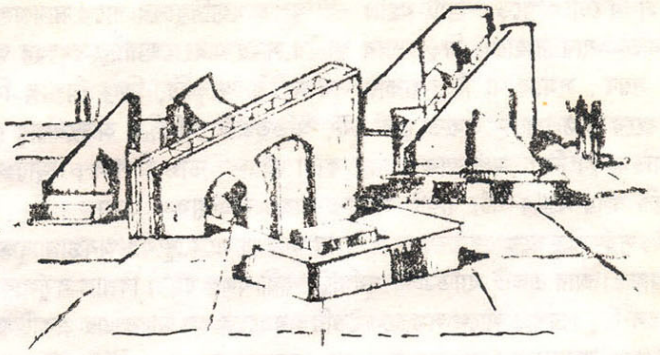
অথচ এই নিয়মটুকু আবিষ্কারের জন্য সেদিন গ্যালিলিওকে কতখানি মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে হয়েছে!

একই বস্তুর উপর দুটি বল কাজ করলে তার যে উপলব্ধি হল সেটা গ্যালিলিওই প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন এবং ফ্লোরেন্সের মিউজিয়ামেও এ সংক্রান্ত মাপজোকের যন্ত্রপাতি রয়েছে।

বস্তুর গতিবিদ্যার জন্য যে ধরনের গাণিতিক বিশ্লেষণ দরকার—পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্যালিলিওই প্রথম তা গড়ে তুলেছিলেন। এটাই পরবর্তী দু'এক শতকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত শক্তিশালী গাণিতিক অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফ্লোরেন্সের বিজ্ঞান ইতিহাস মিউজিয়ামের প্রাচীন আঙ্গিকে এসব জিনিসে চোখ বুলালে, নেড়েচেড়ে দেখলে মনে হয় এই একটি মানুষ কি রকম যৌক্তিক মনের অধিকারী ছিলেন, কি রকম সৃজনশীলতা নিয়ে কাজ করে গেছেন। দূরবীন চোখে মহাকাশের সূক্ষ্ম পরিমাপ আর বলবিদ্যার মৌলিক প্রশ্নগুলো একাকার হয়েছে তাঁর চিন্তনে।

অথচ নিজের সমাজপতিদের কাছে কি আচরণ তিনি পেয়েছিলেন? এমনকি বিদ্যাপতিদের কাছে? তাঁদের অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করেন নি। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে পোপের আদালত তাঁকে শেষ জীবনে অপদস্থ করেছে। এই বিচারের সম্মুখীন হবার জন্য সত্তর বছর বয়সে তাঁকে অপরাধীর বেশে ফ্লোরেন্স থেকে যেতে হয়েছিল রোমে। কিন্তু এই ফ্লোরেন্স সেদিনও যেমন করে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, আজো মনে করিয়ে দিচ্ছে এই অসামান্য পুরুষকে—রেনেসাঁর সব স্মারকগুলোর মধ্যে তাঁকে ধারণ করে। একটু দূরে উফিজী গ্যালারি, মেডিচিদের প্রাসাদ, বহু ঘটনার সাক্ষী পিয়াৎসা ডেল সিনোরিনার চত্বর এসবের মধ্যে এও এক তীর্থ, পুষ্পনগরী ফ্লোরেন্সে—যেখানে রেনেসাঁর সুন্দরতম পুষ্পগুলো বিকশিত হয়েছিল।



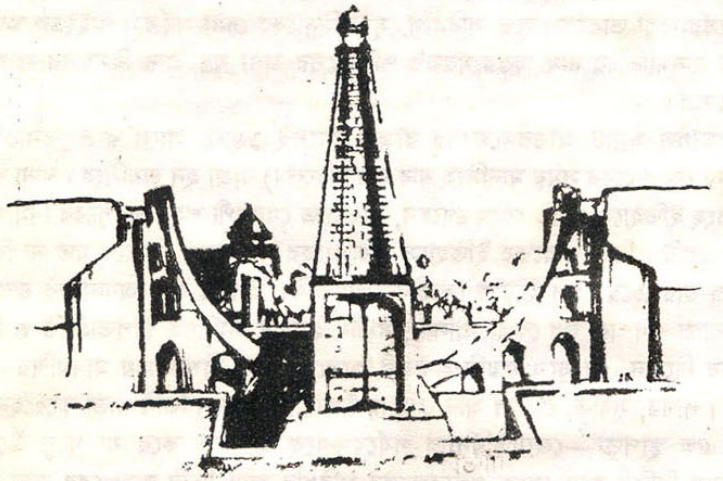
জয়পুর মানমন্দির

বৃদ্ধ গাইড নির্ভুল ভারতীয় উচ্চরণের ইংরেজিতে গড়গড় করে বলে যাচ্ছিলেন প্রত্যেকটি যন্ত্রের আদ্যোপান্ত। মনে হলো একই জিনিস অসংখ্যবার বলার কারণেই তাঁর এই দক্ষতা—জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতার কারণে নয়। তবুও অদ্ভুত ভাল লাগল, জয়পুরের মানমন্দিরে বিশালকায় সব পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতীয় জ্যাতির্বিদ্যার উৎকর্ষের কথা ভাবতে। সূক্ষ্ম পরিমাপ, সূক্ষ্ম হিসাবের চেষ্টা সর্বত্র—গাইডের কথায় এ জন্যই মানমন্দিরের নাম 'যন্তর মন্তর', পরিমাপের জন্য যন্ত্র আর হিসাবের জন্য মন্ত্র, অর্থাৎ সূত্র।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালেই ১৬৯৯ সালে রাজপুতনার অম্বর রাজ্যের (আকবরের সময় মানসিংহ যার রাজা ছিলেন) রাজা হন জয়সিংহ। নানা কারণে জয়সিংহ ইতিহাসে খ্যাতি রেখে গেছেন, সুবিখ্যাত গোলাপী শহর জয়পুরের নির্মাণ তার মধ্যে একটি। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে জয়সিংহের নাম রাজা হিসাবে যত না বিখ্যাত হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে সৌখীন জ্যোতির্বিদ হিসাবে তাঁর অবদানের জন্য। যে যুগে রাজা বাদশারা শুধু কেল্লা, প্রাসাদ, সমাধি ইত্যাদি নির্মাণেই স্থাপত্যপ্রীতি ও বিত্তের পরিচয় দিতেন, সে যুগে জয়সিংহ তৈরি করেছেন তাঁর বিশালকায় মানমন্দির—যন্তর মন্তর। পাথর, সুরকি, পেতল আর লোহার উপাদানে এখানে তিনি খাড়া করেছেন অন্য আর এক স্থাপত্য—জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণকে উপলক্ষ করে যা গড়ে উঠেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য তিনি জয়পুরের মান মন্দির ছাড়াও প্রায় একই ধরনের আরো চারটি মানমন্দির তৈরি করিয়েছিলেন—দিল্লি, বেনারস, উজ্জয়িনী ও মথুরাতে। শেষেরটি ছাড়া এদের সবকয়টি এখনো খাড়া আছে। তবে এদের মধ্যে জয়পুরের মানমন্দিরই সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে ভাল অবস্থায় রক্ষিত রয়েছে।

১৭৩৪ সালে তৈরি হয়েছে জয়পুরে মানমন্দির। জয়সিংহ তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যার ইউরোপীয় মাপজোক এবং সারণীর সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল বৃহদাকার

যন্ত্র তৈরি করে তিনি আরো সূক্ষ্ম পরিমাপ পেতে পারবেন। বিরাট এলাকা জোড়া মানমন্দিরে প্রথম চোখে পড়ে 'সম্রাট যন্ত্র'। এটি মূলত মহাবিষুবের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ একটি সূর্যঘড়ি—যার সাহায্যে নির্ভুলভাবে স্থানীয় সময় এবং জ্যোতিষ্কসমূহের আপত কো নির্ণয় সম্ভব। সমকোণী ত্রিভুজাকার সূর্য ঘড়ির আকৃতি, কিন্তু বিশাল সিঁড়ির আকারে উপরে উঠে গেছে; উচ্চতা ৯০ ফুট, অতিভুজটি পৃথিবীর অক্ষরেখার (উত্তর দক্ষিণ) সমান্তরাল। নিচে অর্ধবৃত্তাকার দাগ কাটা ডায়াল, তাও বিশাল। সম্রাট যন্ত্রের পাশেই 'রাশি বলয় যন্ত্র'। এটা বারটি আলাদা যন্ত্রের সমাহার—প্রত্যেক রাশি চিহ্নের জন্য একটি। সূর্যপরিক্রমণে যখন যে রাশি তখন যথাযথ যন্ত্রে সূর্যের অবস্থান সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। আর একটি ব্যতিক্রমী সূর্যঘড়ি 'নারী বলয় যন্ত্র'। বিশাল বর্তুলাকার এ যন্ত্রের দুই তল বিষুবরেখার সাথে সমতলে তৈরি। বছরের ছয় মাসে এর একটি তলের উপর রোদ পড়ে, অন্য তল তখন ছায়ায় থাকে, ব্যবহৃত হয় না, (রসিক গাইড এখানে দীর্ঘ নিদ্রার উদাহরণ দিতে কুম্ভকর্ণের উল্লেখ করতে ছাড়েননি)। অন্য ছয় মাস উল্টোটি ঘটে। তলের উপর আঁকা রয়েছে ঘণ্টা মিনিটের দাগ নির্ভুল স্থানীয় সময় জানার জন্য। সব কয়টি যন্ত্রেই দাগগুলো খুব সূক্ষ্ম করা সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের বিশালতার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে যে ছায়া এ দাগের উপর মাপা হয় তার সীমারেখা দাগের তুলনায় অত সূক্ষ্ম নয়।

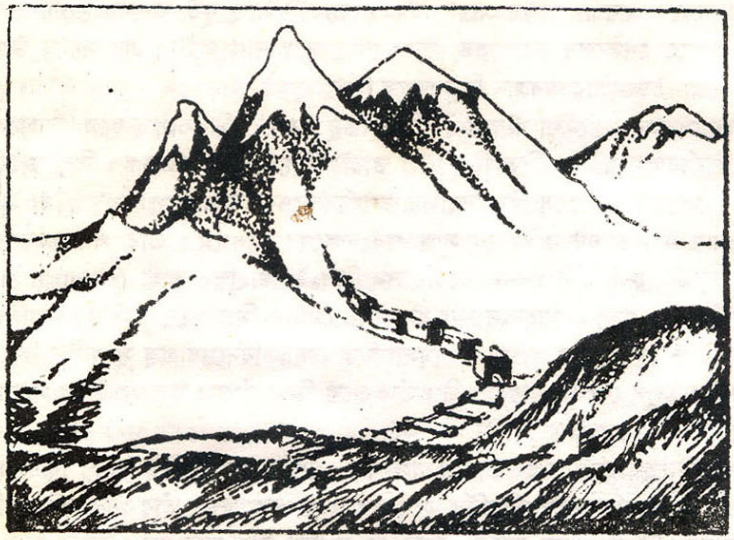


জয়পুর মানমন্দিরের বিশেষ সৌন্দর্যটাই হলো এর যন্ত্রসমূহে আলো আঁধারের অদ্ভুত খেলা, অপূর্ব প্রতিসাম্য। যেমন মাটির উপর কাছাকাছি দুটি বিরাট অর্ধগোলক নিয়ে তৈরি 'জয়প্রকাশ'। সাদা মার্বেলের উপর দাগকাটা কিন্তু পুরোটা অর্ধগোলক সাদা মার্বেলে আচ্ছাদিত নয়, মধ্যে মধ্যে রয়েছে বড় বড় ফাঁক, কালো রঙের বিচিত্র আকৃতিতে। ওর মধ্য দিয়ে মানুষ ঢুকে দাঁড়াতে পারে যে-কোন দাগের কাছে গিয়ে সূক্ষ্ম মাপ নিতে। একটি অর্ধ গোলকে যেসব জায়গা এভাবে ফাঁকা রয়েছে অন্য অর্ধগোলকে

সেগুলো ভরাট ও দাগকাটা, অন্য জায়গা ফাঁকা। এভাবে এরা একে অপরের পরিপূরক। আরো রয়েছে আরবীয় ঢঙের আস্ত্রালেব—প্রত্যেকটি সাত ফুট ব্যাসের ৬০টি লোহার পাত রয়েছে পেতলের আস্ত্রালেব, সারা গায়ে সূক্ষ্ম দাগ কাটা। এর সবের উদ্দেশ্য এক—জ্যোতিষ্কগুলোর অবস্থান নির্ভুলভাবে নির্ণয়।

জয়সিংহের যন্ত্রগুলো অবশ্য মৌলিক কিছু নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেকালে যে রকম পর্যবেক্ষণ যন্ত্র প্রচলিত ছিল এরা তারই বিশালাকার প্রতিরূপ। কিন্তু জয়সিংহ বিশ্বাস করতেন এর ফলে হিসাবের সাথে পর্যবেক্ষণের যে গরমিল তখন দেখা যাচ্ছিল সেগুলোর উন্নতি ঘটবে আরো সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। তাঁর পর্যবেক্ষণের ও হিসাবের ফলাফল তিনি প্রকাশ করেছিলেন জিগ-ই মোহাম্মদ শাহী (মোহাম্মদ শাহের সারণী) নামক গ্রন্থে। মোহাম্মদ শাহ সে সময় মোগল সিংহাসনে আসীন। জয়সিংহের লাইব্রেরিতে ইউরোপের প্রাচীন ও সমসাময়িক জ্যোতির্বিদদের গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল, তা ছাড়া ছিল উলুগ বেগের তারকাপঞ্জী। তাঁর গ্রন্থে তিনি তাঁদের কাজের উপর সংযোজন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

জয়সিংহের সূক্ষ্ম পরিমাপের প্রয়াস খুব বেশি সফল হয়নি। কারণ বিশালাকায় করতে গিয়ে নির্মাণত্রুটিও বিবর্ধিত হয়েছে। কিন্তু আজ যখন তাঁর মান মন্দিরে গিয়ে বিশালতার এই কেন্দ্রভূমে দাঁড়াই তখন সে ব্যর্থতা তুচ্ছ মনে হয়। কারণ যদিও-বা জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণগুলোই নির্মাতার আশু উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁর স্থপতি মন সেই অজুহাতে সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব স্থাপত্যের। জ্যামিতিক আকৃতি, বক্রতলের সৌকর্য এ সব মিলে কার্যকারিতা আর শিল্পের যে মিলন এখানে ঘটেছে তা আধুনিক স্থাপত্যে বিমূর্ত এক্সপ্রেশনিজমকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে জয়সিংহের সার্বিক স্থাপত্যরীতিই অদ্ভুতভাবে আধুনিক ছিল। যন্তর মন্তর দেখে গোলাপী শহর জয়পুরের গ্রাফ পেপারের মত নিখুঁত চৌকো পরিকল্পনার রাস্তাগুলো দিয়ে যখন ফিরছিলাম তখনো এ কথাই মনে হয়েছে। পুরানো দিল্লি বা ঢাকার মত ঘিঞ্জি আঁকা বাঁকা গলিগুঁজি সৃষ্টিটাই যখন নিয়ম ছিল তখন আধুনিক মার্কিনী শহরের মত এই পরিকল্পনা জয়সিংহ পেলেন কোথায়?



আলপসের শৃঙ্গ ইয়ুংফ্রাউ

জেনেভা হ্রদের উপর দিয়ে স্টীমারে জেনেভা থেকে মন্ট্রিখ—ছবির মত দেশ সুইজারল্যান্ডের ছবি এখানে এক রকম প্রশান্ত জলের তীরে তীরে ফুলেল সমতল। কিন্তু এর পর সুইস রেলওয়ে যেখান দিয়ে নিয়ে চললো সে আরেক ছবি। চড়াই, উৎরাই আর সুড়ঙ্গের অপূর্ব কারিগরির ভিতর দিয়ে পেছনে ফেললাম ছোট ছোট সব সাজানো জনপদ। এক নজর দেখলে ভুল করে মনে হয় নৈসর্গিক শোভা দেখা আর নানা সৌখিন ক্রীড়ায় মাতা ছাড়া এখানে বুঝি আর কেউ কিছু করে না। পার হয়ে এলাম সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বের্ন। এই অঞ্চলটি একটি উচ্চ ভূমি—বের্নীজ ওবারল্যান্ড। আর তার পরেই আল-পাস।

ইউরোপের সবচেয়ে উচ্চ পর্বতমালা আল্‌পস; যে আল্‌পস ইউরোপকে নানা জাতিতে ভাগ করতে সহায়তা করেছে তাদের আলাদা করে রেখে; নেপোলিয়ন যে আল্‌পস অতিক্রম করেছেন 'অসম্ভব' কথাটি তাঁর অভিধানে নেই বলে। আল্‌পসের এই অংশকে বলে বের্নীজ আল্‌পস—বলা যায় ফ্রান্স আর অস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত পূর্ব-পশ্চিমে টানা আল্‌পসের মধ্য ভাগ এটা। এখানে আমাদের গন্তব্য আর একটি ছবির মত শহর ইন্টার লেইকেন। দুটি হ্রদের মাঝখানে বলেই ছোট্ট এই শহরের এই নাম। এটি আল্‌পসের একটি উপত্যাকায়। শহরের গুটিকয়েক রাস্তা দিয়ে যেদিকেই হাঁটা যায় মনে হয় এই বুঝি খাড়া উঠে যাওয়া পর্বত পথ আগলে দাঁড়ালো। পর্বতে ঘেরা, দুই হ্রদের গা ঘেঁষে এই শহরটিতে রয়েছে ভারী চমৎকার একটি ইয়োথ হোস্টেল। সেখানে সাক্ষাৎ মিললো বহু পর্বত অভিযাত্রী তরুণ-তরুণী দলের। কিন্তু পর্বত অভিযাত্রার

প্রশিক্ষণ বা সাহস কোনটাই আমাদের নেই। আর আল্‌পসের খাড়া ঢালে স্কিইং করারও কোন প্রশ্ন উঠে না আনাড়ির পক্ষে। কিন্তু ইন্টারলেকেনের কাছেই এমন সহজ সুযোগ রয়েছে যা সারা দুনিয়াতে অনন্য এবং আমাদের মত পর্বত-ভীতুদের জন্য সুবর্ণ। এটি একটি পার্বত্য রেলওয়ে—সুইস কারিগরির এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন। এই রেলপথ অনেকটা খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে গেছে আল্‌পসের অন্যতম প্রধান শৃঙ্গ ইয়ুংফ্রাউ এর বেশ কাছাকাছি পর্যন্ত। এত আরামে আল্‌পস আরোহণ—একি কম ভাগ্যের কথা।

আল্‌পসের উঁচু শৃঙ্গগুলোর মধ্যে ইয়ুংফ্রাউ নানা কারণে বিশিষ্ট। এর উচ্চতা ১৩,৬৪২ ফুট। মন্ট ব্ল্যাংক (১৫,৭৭১ ফুট), মন্টে রোসা (১৫,২০৩ ফুট) এবং ম্যাটার হর্ণের (১৪,৬৯২ ফুট) পরেই এ স্থান উচ্চতার দিক থেকে। পর্বতারোহণ, স্কী ক্রীড়া এবং সর্বোপরি ঐ পার্বত্য রেলওয়ের কারণে ইয়ুংফ্রাউয়ের জনপ্রিয়তা খুব বেশি। জার্মান শব্দ ইয়ুংফ্রাউ এর অর্থ হলো কুমারী। দূর থেকে এই পর্বতটা তার অদ্ভুত সৌম্য সৌন্দর্য নিয়ে চোখ কেড়ে নেয়। ইন্টারলেকেন থেকে মাইল দশেক গেলেই ইয়ুংফ্রাউ এর শুরু। এখানে গ্রিন্ডেলভাল্ড নামক জায়গা থেকে সাধারণ রেলপথে পৌঁছানো যায় বিশিষ্ট পার্বত্য রেলপথের প্রারম্ভিক স্টেশনে।

মূলত এটা একটা বৈদ্যুতিক রেলওয়ে, কিন্তু পর্বতারোহণের উপযোগী করে এটা বিশেষভাবে তৈরি। সরুরেলের উপর ক্ষুদ্রকায় ট্রেনের কামরাগুলো। দুই রেলের মাঝখানে একটি তৃতীয় রেল রয়েছে যার উপর দিয়ে চলে ট্রেনের দাঁতালো কিছু চাকা। এই চাকাগুলোর কারণেই এমন খাড়াভাবে পর্বতারোহণ সম্ভব হয়েছে। দাঁতালো চাকা ট্রেনকে রেলের সাথে আটকিয়ে রাখে; নিচে নেমে আসতে দেয় না। শুঁয়াপোকার মত মাটি কামড়ে এরা ট্রেনকে খাড়া উপরে উঠতে দেয়। ধীরে, অতি ধীরে আমাদের যাত্রা শুরু হলো ইয়ুংফ্রাউ-এর গা বেয়ে শৃঙ্গের দিকে। ঠিক শৃঙ্গ পর্যন্ত না গেলেও এটা আমাদের নিয়ে যাবে ১১,৩৩৩ ফুট উঁচুতে অপেক্ষাকৃত সমতল একটি অংশে যার নাম উয়ুংফ্রাউ ইয়োখ।

যতই আলপ্‌সের উপরে উঠছিলাম প্রাকৃতিক দৃশ্য বদলে যাচ্ছিল। নিচের দিকে সবুজ বন প্রথমে বীচ, ওক গাছেন, আরো উপরে ফার, পাইন আর স্প্রুস গাছের। শিগ্‌গির গাছের পালা শেষ গয়ে গেল—খানিকটা ঘাসের ঝোঁপের অস্তিত্বই শুধু রইলো। এরও পরে সবুজ একেবারেই শেষ, শুধু কঠিন শিলা আর বরফের আভাস। এখানটা তৈরি নাইস, গ্রানাইট ও শিস্‌ট শিলার কঠিন আবরণে। এর কোলে রয়ে গেছে পাষাণ বরফের স্তূপ হিমবাহের অবশেষসমূহ। এক সময় প্লাইস্টোসিন ভূতাত্ত্বিক যুগে আল্‌পসের ঢালে অনেক নিচু পর্যন্ত এমন কি উপত্যকাগুলোতে পর্যন্ত ছিল হিমবাহের রাজত্ব। প্রায় পনর লক্ষ বছর আগে শুরু হয়ে সে যুগ শেষ হয়ে গেছে তাও হাজার বিশেক বছর আগে। এখন হিমবাহের অবশিষ্টাংশের আশ্রয় শুধু পর্বতের উচ্চতম অংশে। এক পর্যায়ে আমরা অতিক্রম করে গেলাম ইয়ুংফ্রাউয়ের তুষার রেখাকে। এর উপরে সবই বরফ, সবই সাদা। ভরা গ্রীষ্মেও এখানকার বরফ গলতে পারে না—চির তুষারের দেশ এটা। আসলে ইয়ুংফ্রাউ পর্বতটাই একটা বৃত্তাকারে বাঁকানো পর্বত কিনারা। এর বেষ্টনীর মাঝখানটায় রয়েছে কয়েকটি হিমবাহের সমন্বয় এদের মিলিত নাম আলেশ হিমবাহ।

এখানকার বরফময় ঢালগুলো স্থানে স্থানে স্কী করার জন্য খুবই উপযোগী। তাই এখানে মেলা বসে গেছে ইউরোপের নানা জায়গা থেকে আসা স্কী ক্রীড়াবিদদের উৎফুল্ল চর্চায়। পথে পথে দু'একটি এমনি জায়গায় তাদের নিবিষ্ট স্কী চারণা। গাছপালা এমন কি ঝোপঝাড় বিবর্জিত একটানা বরফের বিস্তীর্ণ চড়াই উৎরাইয়ের এমন সুযোগ মেলা বড় দুষ্কর। কি তুষার ক্রীড়ামোদীদের কাছে, কি নিসর্গ প্রেমিকদের কাছে এ অনন্য।

যেমনটি মনে করা হয় হিমালয় সম্বন্ধে, তেমনিই এই আলপ্‌সের এই জায়গাগুলোও নাকি একদিন সমুদ্রের অংশ ছিল। প্রায় দশ কোটি বছর আগে এ সাগরের উত্তর ও দক্ষিণের স্থল ভাগ ক্রমেই পরস্পরের কাছে এসেছে। এদের চাপে সমুদ্রের তলায় পড়েছে ভাঁজ—ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে পর্বতের আর উপত্যাকার। কোন জায়গায় এমনি ভাঁজ বিশাল শিলা স্তূপকে একে অন্যের উপর চড়িয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আজকের সুউচ্চ আল্‌পস শৃঙ্গগুলোকে। এই ইউংফ্রাউও হয়তো একদিন এভাবে সমুদ্র বক্ষ থেকে ফুড়ে উঠেছিল অতীতের মহাকালের গর্ভে। সেই সমুদ্র থেকে উঠে আসার নিসর্গ কুমারী আজ তার ঊর্ধ্বগামিতায় আকাশচুম্বী। তার সাগরকন্যা রূপটি নেহাতই ভূতত্ত্ববিদদের কাছেই ধরা পড়ে আজ।

অবশেষে আমাদের পার্বত্য ট্রেন এসে থামলো তার শেষ গন্তব্যে ইয়ুংফ্রাউ ইয়োখ স্টেশন। ১১,৩৩৩ ফুট উঁচুতে এটা দুনিয়ার উচ্চতম রেলওয়ে স্টেশন। আসলে এখানে যা কিছু আছে সবই প্রায় দুনিয়ার উচ্চতম। যে ডাকঘরটিতে টিকেট কিনে সুন্দর পিকচার কার্ডটি পোস্ট করলাম দেশে বন্ধুদের কাছে—সেটি দুনিয়ার উচ্চতম ডাক ঘর। এর সীল মোহরেও তাই লেখা ছিল। তারপর যে রেস্তোরাঁয় বসে কফি খেলাম তা দুনিয়ার উচ্চতম রেস্তোরাঁ। এ হতেই হবে, সুইসদের সাহসী প্রকৌশল ছাড়া কে কবে ভাবতে পেরেছিল যে আল্‌পসের এই উচ্চতায় অনায়াস অবহেলায় উঠে আসবে কষ্ট বিমুখ সব পর্যটকের দল চিঠি লিখতে আর কফি পান করতে।

ইয়ুংফ্রাউ ইয়োখের কাছাকাছি জায়গাটার ঢাল বেশি নয়—একটু সমতল মতো জায়গা এখানে আছে। তাই এখানে সহজে বিচরণ করা যায় আল্‌পসের এত উপরেও। উপর থেকে বের্নীজ আল্‌পসের একটি নয়নাভিরাম দৃশ্য এখান থেকে দেখা গেল। এখানে ইয়ুংফ্রাউয়ের দোসর অন্য পর্বতগুলো আইগার এবং মোন্‌চ। সব কয়টার তুষার রেখা দৃশ্যমান—যেখানে বেষ্টিত হয়ে আছে হিমবাহগুলো। শৃঙ্গগুলোর সাদা তুষার মুকুট অদ্ভুত একটি সৌম্য আবহের সৃষ্টি করেছে। এই তুষার মুকুট থেকে গড়িয়ে পড়া বরফের আঁচলগুলো ফুলের বৃতির আকৃতিতে বরফগলা পানির ধারা এঁকেবেঁকে একে অপরের মধ্যে বিলীন হওয়া এ সব উপভোগ করার জন্য এমন সুন্দর সুউচ্চ দর্শন মঞ্চ আর কোথায় পাওয়া যাবে?

মঞ্চটা নিজেও আগাগোড়া তুষারময়। চারদিকে এত সাদা এবং তাতে সূর্যের প্রতিফলন এত চোখ ধাঁধানো যে রঙিন চশমা ছাড়া বেশিক্ষণ তাকানো দুষ্কর। ইয়ুংফ্রাউ ইয়োখ রেলওয়ে স্টেশনে আশপাশে গড়ে উঠেছে কিছু প্রাসঙ্গিক ঘরবাড়ি। এখানে আছে

বিশ্ববিখ্যাত একটি আলপাইন স্কী স্কুল। স্কীর কৌশল শেখার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে তরুণ-তরুণীরা এখানে আসে। এখানকার ছোট্ট কুটির সদৃশ বরফে ঘেরা বাড়িকে কেন্দ্র করে হিমবাহের সুবিস্তীর্ণ নিরবিচ্ছিন্ন ঢালগুলোতে মনের সুখে স্কী চর্চা করে।

পর্যটকদের জন্য এখানে বরফ খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে সুন্দর এক বরফের ঘর। এর দেয়াল, ছাদ, মেঝ সবই বরফ। শুধু তাই নয় ঘরের আসবাবগুলোও বরফ কেটে তৈরি। এখানকার এই উচ্চতায় এর কোনটাই গলে নষ্ট হওয়ার নয়। হঠাৎ মনে হলো আমাদের স্বাভাবিক জনপদ থেকে কত দূরে সে এক অন্য পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়ে আছি। হালকা বাতাসের কারণে একটা শ্বাসকষ্ট অনুভবের জন্য তৈরি ছিলাম। অনেকের নাকি তা হচ্ছিলও। কিন্তু ঠিক সে রকম কিছু বোধ হলো না। এখানে একটা চুলায় আগুন জ্বালিয়ে পানি ফুটাবার চেষ্টা করলে মন্দ হতো না। বায়ুচাপের সাথে সাথে স্ফুটনাংকের হ্রাসটাও চোখে পড়তো পদার্থবিদ্যার নিয়ম যাচাই হতো। কিন্তু না সে সুযোগ মিললো না। এ সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সিটি শোনা গেল ফিরতি ট্রেনের। ইয়ুংফ্রাউয়ের ঢাল বেয়ে আবার ফিরে যেতে হবে নিচের জগতে। স্মৃতি হয়ে থাকবে আল্‌পস, স্মৃতি হবে তুষার মণ্ডিত ইয়ুংফ্রাউ—আল্‌পসের সুন্দরী কুমারী।